অতীতের কথা

অধ্যাপক: শ্রীহেমেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য, এম্.এ.

অতীতের কথা

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

[ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলসমূহের জন্য
প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত]

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক,
"গাছপালার গল্প", "জীবজগৎ", "প্রকৃতির কথা"
প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্. এ.

প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

১৩৫৩

মূল্য দেড় টাকা
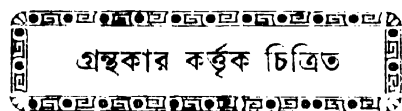
উৎসর্গ

পৃথিবী ও গাছপালার স্থায়

যিনি আমার শত অপরাধ উপেক্ষা করিয়াও আজীবন

নিঃস্বার্থভাবে আমাকে সাদরে তাঁহার স্নেহের

নীড়ে স্থান দান করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন,

সেই প্রত্যক্ষ দেবী

আমার মা

শ্রীযুক্তা হরসুন্দরী দেবীর

চরণকমলে

অতীতের কথা

"পৃথিবী ও গাছপালা"

ভক্তিভরে অর্পণ করিলাম।

তাঁর অকৃতী সন্তান

হেমেন্দ্র

নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ডি. এস-সি., (রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার) মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকাস্বরূপ যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে ; সুতরাং সে বিষয়ের পুনরালোচনা করা—আমি অনাবশ্যক বোধ করিতেছি। এই পুস্তক প্রণয়নে আমি আমার বন্ধুবান্ধব বহু সহৃদয় ব্যক্তির উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের এই উৎসাহ ও সাহায্যের জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এবং ময়মনসিংহের সব্‌জজ, প্রবীণ সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, এম. এ., বি. এল. মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে এই পুস্তক প্রণয়নে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সহৃদয়তার জন্য এই সুযোগে, আমি তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। নিবেদন ইতি—

ময়মনসিংহ
ঝুলন পূর্ণিমা
১৩৪০ সাল

বিনীত
গ্রন্থকার
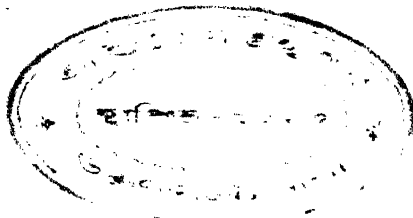
ভূমিকা

"অতীতের কথা" প্রণয়নে শিশু-সাহিত্যের এক চিরানুভূত অভাব দূরীকৃত হইল। পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন শিশুমুখে ব্যক্ত হয় ও আমরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে সকলেই অবগত আছি যে, সেই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান সম্বন্ধে প্রাচীনেরা অজ্ঞতা নিবন্ধন বহু অবান্তর কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। হেমেন্দ্রবাবুর এই পুস্তক সেই হিসাবে নবীন প্রবীণ সকলেরই তুল্য আদরের জিনিস হইবে।

শিশুপ্রকৃতির স্বাভাবিক কৌতূহল চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই শিশু-সাহিত্যের প্রয়োজন। সেজন্য নৈতিক ধর্ম্মালোচনা ও ইতিহাসচর্চ্চা শিশু-সাহিত্যে যে প্রকার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, ভাষার ও ভাবের অস্ফুটতার জন্য বৈজ্ঞানিক আলোচনা সেরূপ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর, ৺জগদানন্দ ও আরও অনেকে এবিষয়ে সফল প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু এখনও বহু অভাব অপূর্ণ রহিয়াছে। অধ্যাপক হেমেন্দ্রকুমার তাঁহার "গাছপালার গল্প" ও "জীবজগৎ" পুস্তকদ্বয়ে নীরস বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ সরস-প্রাঞ্জল ভাষায় শিশুদিগের বুঝিবার উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিবার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ পুস্তক তাঁহার সেই শক্তির উজ্জ্বলতর নিদর্শন।

এই পুস্তকে আমাদের এই জগৎ ও জাগতিক জীবজন্তু উদ্ভিদাদির উদ্ভব ও তাহাদের ক্রম-বিবর্ত্তনের ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে আলোচিত হইয়াছে। সৌরজগতের উৎপত্তি ও তাহাতে আমাদের বাসস্থান, এই পৃথিবীর সমাবেশ-বৃত্তান্ত ; যুগে যুগে ধারাবাহিকক্রমে স্তর-বিন্যাস জনিত পৃথিবীর পরিবর্ত্তন, ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদাদির প্রাথমিক আকার ও আবির্ভাবের কথা ও তাহাদের ক্রমিক পরিণতি ; সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যুগে যুগে ক্ষুদ্র বৃহৎ ও অতিকায় প্রাণীর আবির্ভাব ও তিরোভাবের কাহিনী ; ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে প্রাণিজগতে শ্রেষ্ঠ ও

সুসভ্য মানব জাতির অভ্যুদয় প্রভৃতি বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখারই ইতিহাস শিশুদের উপযোগী ভাষায় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার শিশুচিত্তের কৌতূহল সম্ভূত সর্ব্বপ্রকার প্রশ্নই সরল ভাষা ও চিত্তাকর্ষক চিত্রের সাহায্যে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সকল দুরূহ বিষয় এপ্রকার সহজ বোধগম্য করা যায় তাহা হেমেন্দ্রবাবুর এই প্রচেষ্টা না দেখিলে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইত।

শিশু-সাহিত্যকে এই প্রকারে সম্পৎশালী করিবার চেষ্টায় হেমেন্দ্রবাবু বঙ্গভাষী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহার লেখনী অক্ষয় হউক ও তিনি উত্তরোত্তর বাংলা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন। ইতি—

বিজ্ঞান কলেজ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় }
২৫শে আষাঢ়, ১৩৪০ সন।

ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
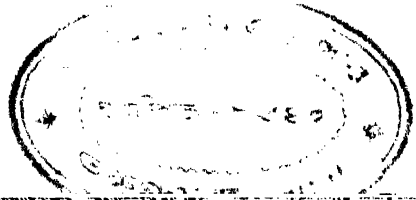
অতীতের কথা

যাহার কোলে মোদের খেলা
এই সে ধরা,
কোন্ অতীতে কেমন ক'রে
হইল গড়া ?

যে পৃথিবীর উপর তোমরা খেলাধূলা করিয়া মনের আনন্দে বিচরণ করিতেছ, কোথা হইতে কি ভাবে উহার উৎপত্তি হইল তাহা কি কখনও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ ? মাতা, পিতা ও শিক্ষক মহাশয়ের নিকট তোমরা অনেকেই হয়ত শুনিয়াছ যে, ভগবান এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে জলবায়ু, গাছপালা, পশুপক্ষী, মানুষ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্য বিভিন্ন দেশের

ধর্ম্মপুস্তকেও নানা ভাবে এই কথাই বলা হইয়াছে। তোমরা অনেকেই হয়ত একথাতেই সন্তুষ্ট; কিন্তু প্রবীণ জ্ঞানী বৈজ্ঞানিকগণ শুধু একথাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বলেন যে, ভগবান দ্বারাই হউক, কিংবা আপনা হইতেই হউক, পৃথিবীর যখন সৃষ্টি হইয়াছে তখন ইহার সৃষ্টির একটা ধারা অর্থাৎ প্রণালীও আছে। সুতরাং ইহার উৎপত্তি অর্থাৎ সৃষ্টির প্রণালী আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিব না কেন? ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, শুধু একথার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে, আমরা তাঁহার সৃষ্টির বৈচিত্র্য বুঝিবার আনন্দই বা কোথা হইতে লাভ করিব? এরূপ ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, জগতের বহু সত্য হইতে মানব চিরকালই বঞ্চিত থাকিবে। তাহা হইলে মানুষ আর পশুতে কি তফাৎ রহিল? তাঁহাদের এই ইচ্ছা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে জগতে আজ বহু সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তোমাদের মধ্যেও যাহাদের মনে এই মহৎ ইচ্ছা সত্য সত্যই জাগরিত হইবে তাহারাও বহু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবে। পৃথিবীর উৎপত্তি ও অতীত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন এখানে তাহারই আলোচনা করা হইল। তাহা হইতে তোমরা পৃথিবীর উৎপত্তি, যুগে যুগে নব নব স্তরের গঠন ও উহার আকারের পরিবর্ত্তন, সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম প্রাণী এবং উদ্ভিদের আবির্ভাব এবং তিরোভাবের বিষয় অনেক কথাই জানিতে পারিবে।

পৃথিবী সম্বন্ধে এই আলোচনা পৃথিবীর মতই বিস্তৃত এবং উহার কোন কোন বিষয়ের আলোচনা শুধু জ্ঞানী বিশেষজ্ঞের পক্ষেই সম্ভবপর। একথা সত্য হইলেও, মোটামুটি উহার সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমরা এখন হইতেই জানিতে এবং শিখিতে পার। একটুক্‌রা শিল-নুড়ি যাহা তোমরা সচরাচর দেখিতে পাও, তাহার মধ্যেই পৃথিবীর অতীতের কত কথা যে নিহিত আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শুধু জানিবার আগ্রহ থাকিলেই উহার সম্বন্ধে বহু কথা তোমরা জানিতে পার, সেজন্য খুব বিদ্যাবুদ্ধিরও যে বিশেষ প্রয়োজন

তাহা মনে হয় না। ডাক্তার উইলিয়াম স্মিথ (Dr. William Smith), যাঁহাকে ইংরেজদিগের মধ্যে ভূতত্ত্বের আদি প্রবর্ত্তক বলা হইয়া থাকে, তাঁহার শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালাতেই শেষ হইয়াছিল। অন্ততঃ তেমন বিশেষ কোন শিক্ষা তাঁহার ছিল না, যে কারণে তাঁহাকে এরূপ উচ্চ আসন দেওয়া যাইতে পারে। তিনি তাঁহার কার্য্যোপলক্ষে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন। সেই সময় তিনি পৃথিবীর স্তর সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া এই চিরস্থায়ী সুনাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। হিউ মিলার (Hugh Miller) সাহেব একজন সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্বজ্ঞ। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত বইগুলি খুবই মূল্যবান। তিনি একজন সাধারণ নাবিকের ছেলে এবং বিশেষ যে শিক্ষিত ছিলেন তাহাও নহে। তাঁহার প্রথমজীবনে তিনি রাজমিস্ত্রীর কাজ করিতেন এবং পরবর্ত্তীকালে ব্যাঙ্কের হিসাব-রক্ষকের পদ পাইয়াছিলেন। এসকল উদাহরণ হইতেই তোমরা বুঝিতে পার যে, জানিবার ও শিখিবার আগ্রহ থাকিলে ভূতত্ত্বের আলোচনা তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। যে পৃথিবীর উপর মানব আজন্ম লালিত পালিত এবং বর্দ্ধিত হয়, মানবমাত্রেরই তাহার তত্ত্ব অন্ততঃ কতক পরিমাণে হইলেও জানা কর্ত্তব্য।

পৃথিবীর উৎপত্তি, গঠন ও নানা রকম পরিবর্ত্তনের কথা জানিতে হইলে, সৌরজগতের কথাও অন্ততঃ সাধারণ ভাবে জানা দরকার। কেননা সূর্য্য হইতেই পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ।

অতীত যুগে মানুষমাত্রেই যখন অসভ্য এবং অশিক্ষিত ছিল, তখন তাহাদের ধারণা ছিল যে, পৃথিবী একটি সমতল ভূমি মাত্র। অনন্ত নীল আকাশ তাহার উপর একটি চন্দ্রাতপ বা চাঁদোয়া। তাহার ভিতর দিয়া সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্রগণ কোন অজ্ঞাত পাতালপুরীর পথে যাতায়াত করে মানুষ তাহা জানিতে পারে না। বহু কাল পর্য্যন্ত তাহাদের আরও একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র আজকাল যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বেও তাহারা ঠিক

তেমনি ছিল অর্থাৎ সৃষ্টির আদি হইতে একই ভাবে তাহারা বর্ত্তমান আছে। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রাচীন মানবের এরূপ বহু অদ্ভুত ধারণার কথা তোমরাও হয়ত অনেকে শুনিয়াছ। সে-সব কথার আলোচনা এখানে আর বিশেষ দরকার নাই।

পৃথিবীর অভাবে আমাদের বাঁচিয়া থাকা ত দূরের কথা, অস্তিত্বেরও কল্পনা করিতে পারি না। সে হিসাবে উহার সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এখনও
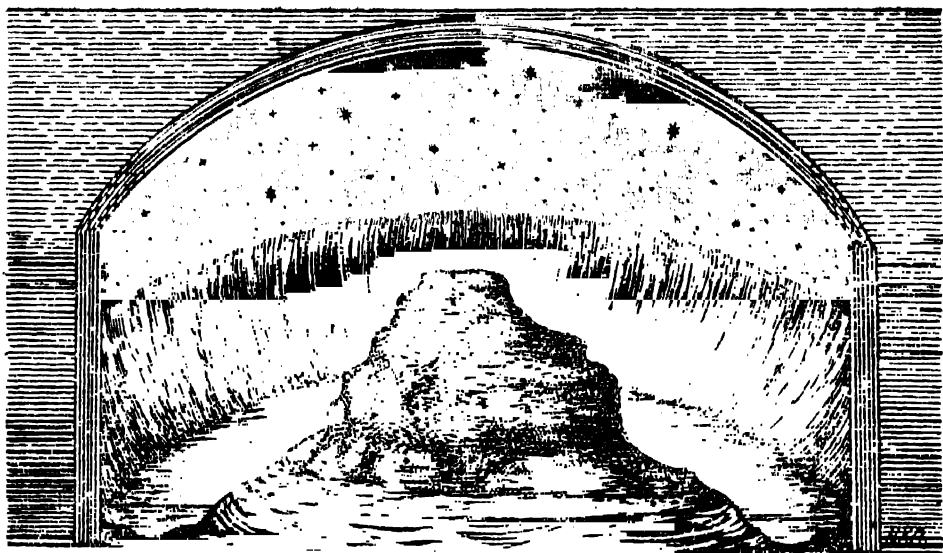
প্রাচীনকালের মানবের ধারণামূলক পৃথিবীর একটি ছবি
(তৎকালীন মানবের ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকই জলদ্বারা বেষ্টিত।)

কিন্তু খুব বেশী নয়। যাহার উৎপত্তি এবং গঠন কেহ কখনও দেখে নাই; তাহার সত্য নির্দ্ধারণ যে সময়-সাপেক্ষ, এবং তাহাতে যে পদে পদেই ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? সুতরাং এবিষয়ে কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না। বরং জানিবার চেষ্টাই এসব বিষয়ে প্রশংসার বিষয়।

সূর্য্য রাজা রাজ্য করে
সৌরজগৎ নামটি তার,
চক্রাকারে পৃথ্বী ঘুরে
চন্দ্র ঘুরে সঙ্গে যার।

সৌরজগতের উৎপত্তির কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সৌরজগৎ কি এবং সৌরজগতে পৃথিবীর স্থান কোথায় তাহা জানা দরকার। সাধারণ ভাবে সেকথাই এখানে বলা হইবে।

সৌরজগতের অধিপতি সূর্য্য। এই সূর্য্য কি? কেন পৃথিবী তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? সূর্য্যের সঙ্গে পৃথিবীর সম্বন্ধ কি? এসকল কথা চিন্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মনে পড়ে আকাশের চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের কথা। যদিও পৃথিবীর উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করাই প্রধান উদ্দেশ্য তবু চন্দ্র, সূর্য্য এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের কথাও এই সঙ্গে মনে উদয় না হইয়া যায় না। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর ন্যায় উহারাও ছেলে বুড়া সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাহাদের সকল কথাই এক অজ্ঞাত রহস্যপূর্ণ। তা ছাড়া অন্য কারণও আছে যাহা তোমরা পরে বুঝিতে পারিবে। উহারা সকলেই সূর্য্যের সঙ্গে বিশেষ রকম সম্বন্ধ বিশিষ্ট। কম হউক বেশী হউক একে অন্যেও পরস্পর আকর্ষণ আছে। সূর্য্যকে মধ্যে রাখিয়া উহারা সকলেই উহাদের নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য পথে, সীমাহীন অনন্ত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের গতি এবং ভ্রমণপথের সীমাও তাবার নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন। তাহাদের সকলকেই সূর্য্য রাজার রাজ্যের আইন বা নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। গ্রহ-উপগ্রহ সকলকে নিয়া সূর্য্যের এই যে রাজ্য তাহার নাম "সৌরজগৎ"। আমাদের পৃথিবী এই সৌরজগতের মাঝামাঝি আকারের একটি গ্রহ মাত্র। এখন ভাবিয়া দেখ, উহাদিগকে একেবারে বাদ দিয়া, কেবলমাত্র পৃথিবীর কথা আলোচনা করা কতটা সম্ভবপর হইবে। তোমরা

যদি কোন লোকের জীবনী লিখিতে চাও, তবে তাহার পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নী কিংবা তাহার অন্যান্য সম্পর্কিত লোকের কথা বাদ দিলে, তাহা যেমন অসম্পূর্ণ
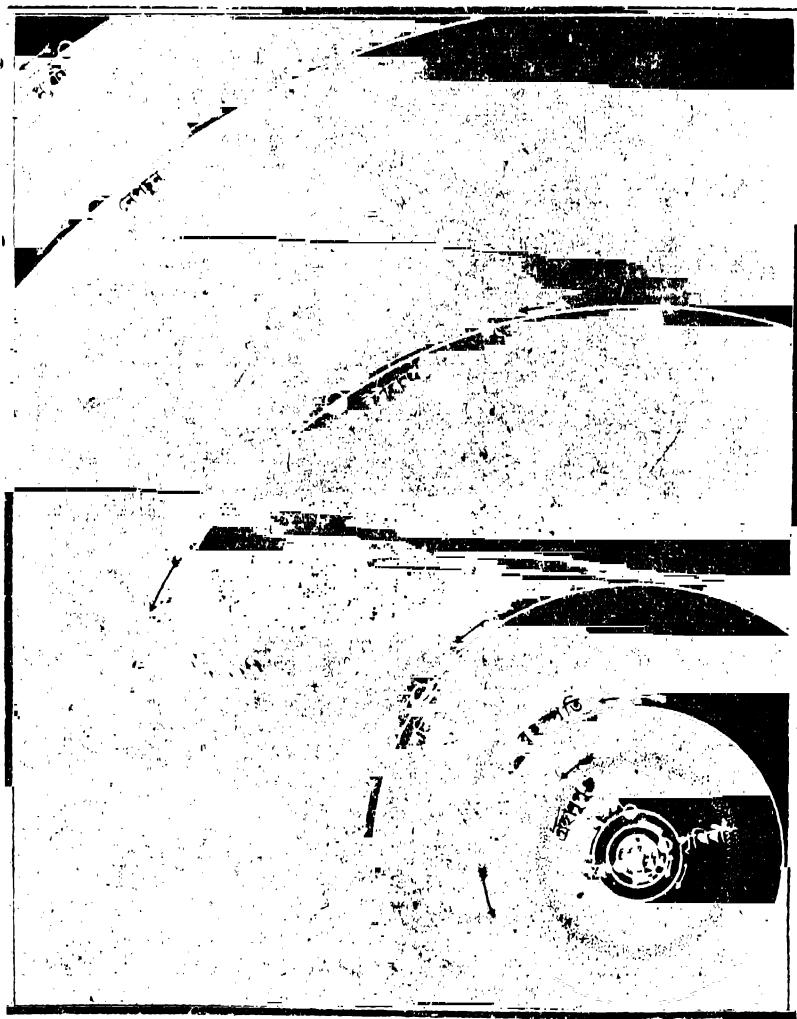
সৌরজগতের মানচিত্র

থাকিয়া যায়, তেমনি সূর্য্য এবং অন্যান্য গ্রহের কথা বাদ দিয়া, শুধু পৃথিবীর

কথা বলিলে পৃথিবীর কথাও সম্পূর্ণ বলা হইবে না। সেজন্য পৃথিবীর সঙ্গে ইহাদের কথাও কিছু বলিতে হইতেছে।

সূর্য্যকে আমরা একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডরূপে দেখিতে পাই। উহার চতুর্দ্দিকে বৎসরের পর বৎসর পৃথিবী, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহগণ কতকাল যাবৎ যে ভ্রমণ করিতেছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ইহাদের এই গতির কখনও বিরাম কিংবা বিশ্রাম নাই। সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী গ্রহের নাম বুধগ্রহ (Mercury), বুধগ্রহের পর শুক্রগ্রহের (Venus) স্থান, তারপরেই পৃথিবী অবস্থিত। পৃথিবীর পরে যথাক্রমে মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনস্ (Uranus), নেপচুন (Neptune) নামক গ্রহের স্থান। ইহাদের মধ্যে নেপচুন সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী গ্রহ। মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের ভ্রমণপথের মধ্যবর্ত্তী আকাশে অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। দূরত্ব এবং গতির
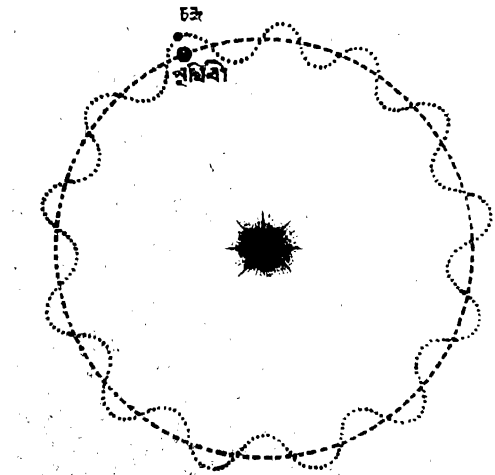
পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্রের গতিপথ

ইতরবিশেষে ইহাদের সকলেরই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সময়ের যথেষ্ট তারতম্য হইয়া থাকে। যে সময়ে পৃথিবী সূর্য্যকে একশত বারের বেশী প্রদক্ষিণ করিতে পারে, সেই সময় মধ্যে সূর্য্য হইতে দূরবর্ত্তী অন্য একটি গ্রহ হয়ত সূর্য্যকে মাত্র একবার প্রদক্ষিণ করিবে। সুতরাং উহাদের প্রত্যেকের গতি এবং ভ্রমণপথের দূরত্ব যে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। চন্দ্রের সূর্য্য প্রদক্ষিণে আবার একটু বিশেষত্ব আছে। পৃথিবী এবং অন্যান্য

গ্রহের মত চন্দ্র যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে সমানেই ঘুরিতে থাকে তাহা নহে। উহা একদিকে যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আবার পৃথিবীকেও প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে চন্দ্রের ভ্রমণ-প্রণালীর ছবি পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল, তাহা হইতেই তোমরা উহা বুঝিতে পারিবে। পৃথিবীর ন্যায় সৌরজগতের অন্যান্য প্রায় সকল গ্রহেরই এরূপ অনুগামী একাধিক চন্দ্র আছে; কিন্তু সেইগুলিকে তোমরা পৃথিবীর চন্দ্রের ন্যায় খালি চোখে দেখিতে পাইবে না। তাহাদের মধ্যে মঙ্গলগ্রহের
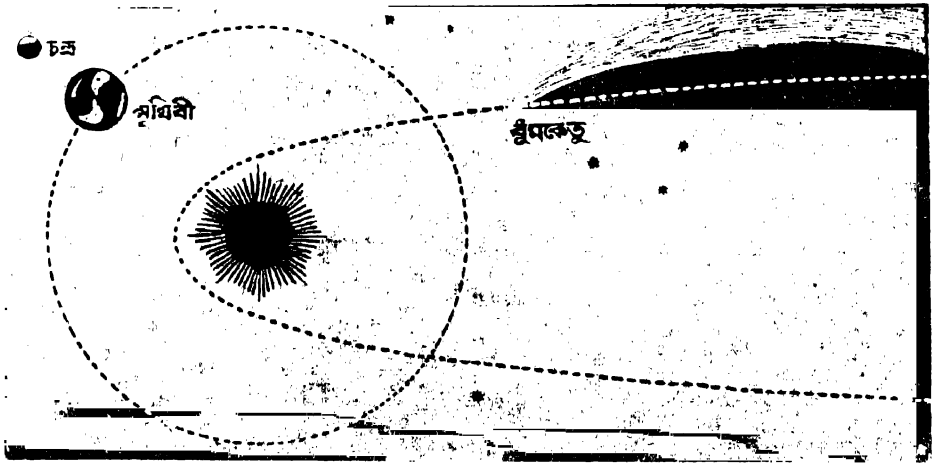
ধূমকেতু এবং তাহার গতিপথ

দুইটি, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের প্রত্যেকের নয়টি, ইউরেনসের চারিটি এবং নেপচুনের মাত্র একটি চন্দ্র আছে।

উজ্জ্বল বাষ্পে গঠিত ধূমকেতু নামক, অনেকটা ঝাঁটার মত ল্যাজ বিশিষ্ট, অন্য একটি আকাশপথে ভ্রমণকারী আশ্চর্য্য জিনিষের কথা তোমরা হয়ত অনেকেই শুনিয়াছ। উহাদের ল্যাজ লক্ষ লক্ষ যোজন বিস্তৃত। এই সৌরজগতের সীমার বাহিরে, অসীম অনন্ত আকাশ হইতে হঠাৎ আসিয়া উহারা দেখা দেয়। এই সকল ধূমকেতুর ভ্রমণপথ, পূর্ব্বোক্ত

সকল গ্রহকে অতিক্রম করিয়া যায়। সেজন্য কোন কোন ধূমকেতু যখন পৃথিবীর কাছে আসে তখনই শুধু দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য সময় দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর কাছে আসিলেও কোন কোন ধূমকেতু এত দূরে থাকে যে, দূরবীক্ষণের সাহায্য ছাড়া খালি চোখে দেখা অসম্ভব। হেলির (Haley's) ধূমকেতুর কথা হয়ত তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে উহা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। সুদীর্ঘ ৭৫ বৎসর ভ্রমণের পর উহা এক এক বার পৃথিবীর কাছে আসে, তখন উহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে উহাকে দেখিবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। তোমাদের মধ্যে যাহারা সে সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে তাহারাই তখন এই ধূমকেতু দেখিতে পাইবে।

ভুলভ্রান্তির স্রোতের শেষে,
সত্য যা তাই উঠ্‌ল ভেসে।

সৌরজগৎ সম্পর্কে যে সকল কথা এখানে বলা হইল তাহা কিরূপে এবং কখন মানুষ বুঝিতে পারিয়াছিল তাহা তোমাদের সকলেরই জানা উচিত। অবশ্য ইহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে। সাধারণভাবে যতটুকু সম্ভব তাহাই বলা হইবে। এরপর তোমরা নিজেরাও আলোচনা করিয়া এসম্বন্ধে বহু কথা জানিতে পারিবে। পৃথিবী সম্বন্ধে শতেক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও অধিকাংশ মানুষের মনে বহু ভ্রান্ত ধারণা ছিল। সে সকল ধারণা অন্ততঃ শিক্ষিত লোকের মন হইতে এখন দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর আকার সমতল নহে, কমলালেবুর মত গোলাকার। উহা স্থির অর্থাৎ নিশ্চল ত নয়ই, বরং লাটিমের মত হেলানভাবে আবর্ত্তিত হইয়া দ্রুতবেগে সূর্য্যের চারিদিকে নির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এসব কথা আজ তোমরা সকলেই জান এবং বিশ্বাস কর। এমন একদিন গিয়াছে যখন তৎকালীন জ্ঞানীদিগের এসকল কথা পাগলের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। তাঁহারা কিন্তু নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও এসকল সত্যের প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে আকাশের কথা জানিবার আগ্রহ জন্মিয়াছিল। চীন ও বেবিলনের জ্যোতির্বিবদ্‌গণ বহুশত বৎসর গ্রহ-নক্ষত্রের যাতায়াত লক্ষ্য করিয়াও পৃথিবী যে গোলাকার তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

প্রাচীন ভারতের মনীষী ঋষিগণ কিন্তু ভূতত্ত্ব এবং খতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ পুরাণাদিতে পৃথিবী সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে তাহা অবশ্য কাল্পনিক, পৃথিবীর এরূপ কাল্পনিক বর্ণনা প্রায় সকল দেশের ধর্ম্মগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া ভূতত্ত্ব ও খতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতের অন্যান্য সুপ্রাচীন গ্রন্থে যে সকল কথার উল্লেখ আছে তাহাতে আমাদের প্রাচীন যুগের ঋষিগণ যে এসব বিষয়ে বেশ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য্য ঋষিগণের প্রাচীন গ্রন্থ উপনিষদে 'ভূগোল' এই কথার উল্লেখ আছে। তাহা হইতে পৃথিবী যে গোলাকার, বৈদিক যুগেই ভারতীয় ঋষিগণ সে কথা বুঝিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।

মহারাজ জয়সিংহ

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কুসুমপুর-নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর আর্য্যভট্ খতত্ত্ব সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ কয়েকখানা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে খতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গণিত-জ্যোতিষী ভাস্করাচার্য্যের নাম হয়ত তোমরাও অনেকে জান। তিনি অবশ্য পরবর্ত্তী সময়ের লোক কিন্তু তাই বলিয়া নিতান্ত আধুনিক নহেন। তিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী অম্বরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ জ্যোতিষের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন।

জয়পুর, দিল্লী, উজ্জয়িনী, কাশী ও মথুরাতে তিনি যে কয়েকটি জ্যোতিষের মানমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন সেইগুলি আজও তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা

দিল্লীর একটি মানমন্দির

কোপারনিকাস

করিতেছে। প্রাচীন ভারতের এই গৌরব রক্ষার চেষ্টা তোমাদের প্রত্যেকেরই করা কর্ত্তব্য। গ্রীসদেশবাসী প্রাচীন পণ্ডিতগণ পৃথিবী যে গোলাকার তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড যে কি প্রকাণ্ড তাহার ধারণা করিতে পারেন নাই। পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রগণ এই যে

গেলিলিও

গেলিলিওর দূরবীক্ষণ

পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে, এই যে ধারণা, তাহাতে কোন কোন পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞানী ব্যক্তির
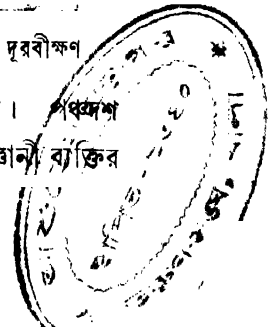
মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সময় কোপারনিকাস (Copernicus) নামক একজন প্রাচীন মনস্বী পণ্ডিত, সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র পৃথিবীর স্থলে সূর্য্যকেই কেন্দ্র করিয়া যে ভ্রমণ করিতেছে সেই মত প্রচার করেন। তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে পণ্ডিতপ্রবর গেলিলিও (Galileo) দূরবীক্ষণ নামক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তাহার সাহায্যে, কোপারনিকাসের কথাই যে ঠিক তাহা বুঝাইয়া দেন। তখন হইতে প্রায় সকল লোকই এই মতের পক্ষপাতী। গেলিলিওর আবিষ্কৃত এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র মানবের চিন্তাধারার মধ্যে বাস্তবিকই এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গণিতজ্যোতিষেরও বহু উন্নতি হইয়াছে। ইহাতে মানুষের বহু ভ্রান্ত ধারণা এখন দূর হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রস্থলে সূর্য্যের অবস্থান, সৌরজগতের এই যে বর্ত্তমান ধারণা তাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই আমরা অভ্রান্তরূপে জানিতে পারিয়াছি। গণিতজ্যোতিষে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহার সাহায্যে আজ ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সূর্য্যাপেক্ষাও আকারে বহুগুণ বড় নক্ষত্রের অভাব নাই। আমাদের সূর্য্য তাহাদের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র।

রাঙ্গা তপন, মোদের ধরা,
চন্দ্র তারায় আকাশ ভরা,
তাদের আকার দূরত্ব যা
দূরবীণে সব পড়্‌ল ধরা।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল গ্রহ-নক্ষত্রের পরস্পর তুলনামূলক আকার এবং পরস্পরের দূরত্বের পরিমাণও বর্ত্তমানে পণ্ডিতগণ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। সূর্য্য অন্যান্য নিশ্চল গ্রহ অপেক্ষা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী গ্রহ। অবশ্য গ্রহ মাত্রেরই কম হউক, বেশী হউক একটা গতি আছে, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কোন গ্রহই স্থির অথবা নিশ্চল নহে। তবে পৃথিবী হইতে বহু দূরে
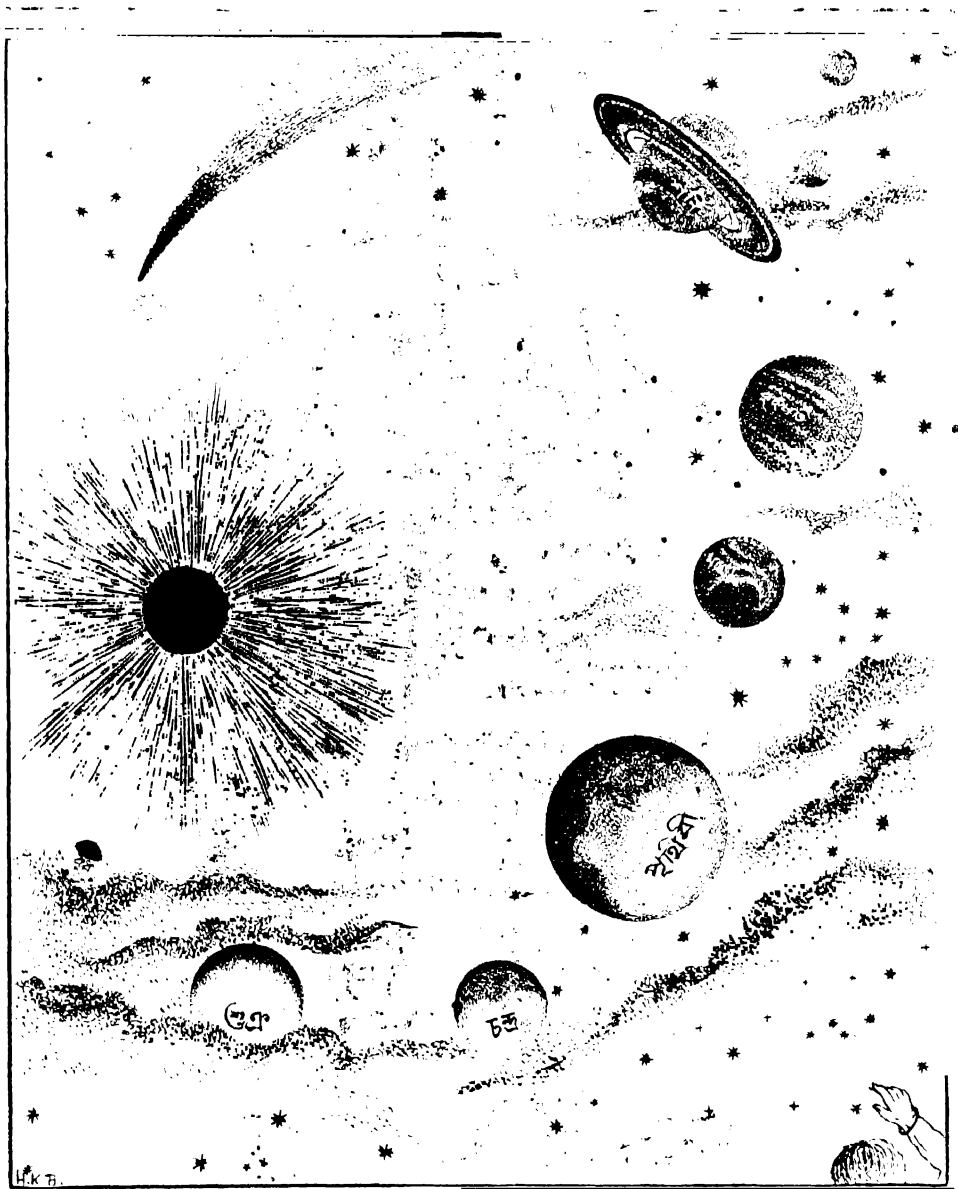
সৌরজগতে শোভাযাত্রা

[পৃথিবী, এমন কি সৌরজগতের বাহিরে কোন স্থানে দাঁড়াইয়া সৌরজগৎ দেখিবার সুযোগ পাইলে, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহ-নক্ষত্রের এই শোভাযাত্রা যেরূপ দেখা যাইবে, তাহার চিত্র ।]

আছে বলিয়া আপাততঃ দেখিতে যে সকল গ্রহকে স্থির অথবা নিশ্চল বলিয়া বোধ হয়, সূর্য্য তাহাদের মধ্যে একটি। সূর্য্যের যা গতি আছে যদিও তাহা খুবই প্রবল, কিন্তু বহু দূরে অবস্থিত বলিয়া আমরা তাহার গতি লক্ষ্য করিতে পারি না। উহা বৃহৎ অগ্নিপিণ্ডের মত, তাহাতেই অন্যান্য স্থির গ্রহ হইতে উহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের দেখাইয়া থাকে। বাস্তবিক কিন্তু অন্যান্য গ্রহ সূর্য্য হইতে বহুগুণে বড়। পৃথিবী হইতে উহারা বহু দূরে আছে বলিয়াই সূর্য্যাপেক্ষা ছোট এবং ক্ষীণপ্রভ বলিয়া মনে হয়। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইলের কম নহে। ইহাতেই যদি সূর্য্য আমাদের নিকটবর্ত্তী গ্রহ হয় তবে ঐ যে বহু দূরবর্ত্তী নক্ষত্রগুলি যাহারা আকারে সূর্য্যাপেক্ষা বহুগুণে বড় তাহারা কতদূরে অবস্থিত, এখন একবার ভাবিয়া দেখ। সূর্য্যের আয়তন পৃথিবী হইতে সোয়া লক্ষ গুণ বড়। সূর্য্যের তুলনায় পৃথিবী নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও তাহারও ব্যাস এবং পরিধি যথাক্রমে ৭,৯২৬ মাইল এবং পঁচিশ হাজার মাইল। এরূপ হাজার হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ মাইলের ধারণা করা তোমরা কেন, কাহারও পক্ষেই সহজ ব্যাপার নয়। তাই বিশাল সৌর-জগৎ যাহাতে সহজে তোমরা তোমাদের ধারণার মধ্যে আনিতে পার, সেজন্য এখানে তাহার একটি উপায় বলিয়া দিতেছি। তোমরা সকলেই ভূচিত্রাবলী দেখিয়াছ। তাহাতে এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থান হইতেই তোমরা হাজার মাইল কিংবা ততোধিক বিস্তৃত স্থানের ধারণা কর। সেইরূপে তোমরা যদি একটি তুলনামূলক ক্ষুদ্র সৌরজগতের কল্পনা করিতে পার, তবে আর উহার ধারণা করিতে তোমাদের কোন অসুবিধা হইবে না।

ধর তোমাদের কল্পিত ক্ষুদ্র সৌরজগতে পৃথিবীর আকার এক ইঞ্চি পরিমাণ ব্যাস বিশিষ্ট একটি বলের মত। তাহা হইলে সূর্য্য এবং সৌর-জগতের অন্যান্য গ্রহের আকার এবং দূরত্ব কি দাঁড়াইবে এখন তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। সূর্য্যকে তখন উহার তুলনায় তিনগজ বা ছয়হাত ব্যাস বিশিষ্ট একটি জ্বলন্ত অগ্নিগোলকরূপে মনে করা যাইতে
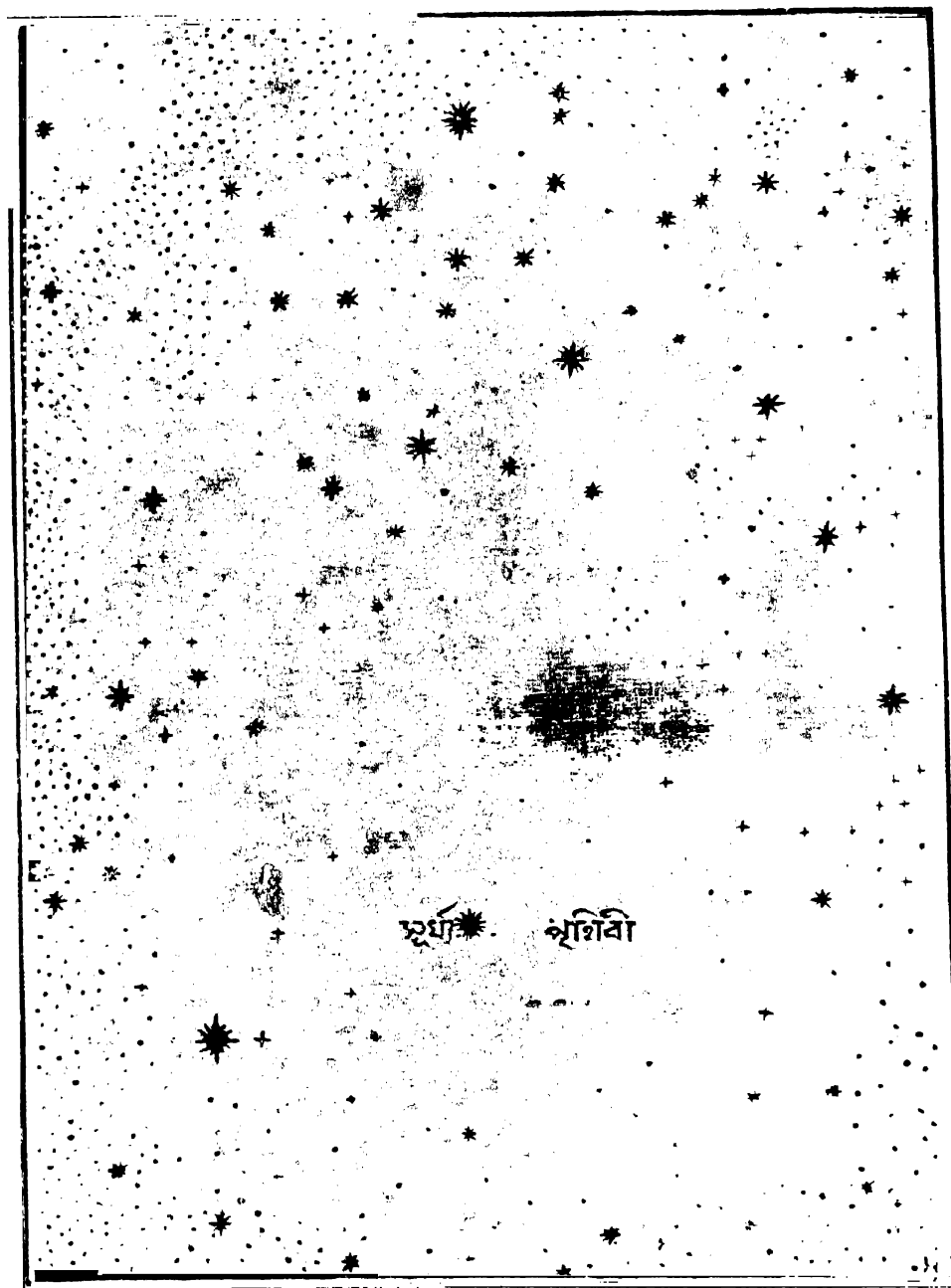
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অংশের তুলনায় আমাদের পৃথিবী

পারে; আর সেই মাপে পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব হইবে ৩২২ গজ। ইহাদের তুলনায় চন্দ্রের আকার মাত্র একটি গোলাকার মটরকলাইর মত। পৃথিবী হইতে তাহার দূরত্বও ৩০ ত্রিশ ইঞ্চির বেশী হইবে না। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের আরও নিকটবর্ত্তী অন্য দুইটি গ্রহ যথা বুধ ও শুক্র, সূর্য্য হইতে যথাক্রমে ১২৪ ও ২৩২ গজ দূরে থাকিবে। তারপর সৌরজগতের অন্যান্য দূরবর্ত্তী গ্রহ মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস ও নেপচুন সূর্য্য হইতে যথাক্রমে ৪৮৮, ১৬৭২, ৩০৬৭, ৬১৬৯, ৯৬৬৬ গজ দূরে দূরে অবস্থিত হইবে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির ভ্রমণ-পথের মধ্যে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আছে তাহাদের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহা বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। এই সঙ্গে সৌরজগতের যে মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে তোমরা সকলেই এখন সৌরজগতের মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারিবে। কিন্তু একথা তোমরা মনে রাখিও যে তোমাদের কল্পিত এই সৌরজগতে, চন্দ্র এবং পৃথিবীর যে দূরত্ব মাত্র ত্রিশ ইঞ্চি, তাহারই বাস্তবিক পরিমাণ ২৪০০০০, দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল। এখন অন্যান্য গ্রহ পৃথিবী হইতে যে কত লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে হইবে তাহা বুঝিতেই পারিতেছ।

সীমাহীন অনন্ত আকাশে সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ এবং পৃথিবীর স্থান যে কোথায় মোটামুটিভাবে এখানে বলা হইয়াছে। তাহা হইতে তোমরা বোধ হয় ইহা বুঝিতে পারিয়াছ যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতির তুলনায় আমাদের পৃথিবী সামান্য একটি বিন্দুমাত্র। পৃথিবী সম্বন্ধে আর দুই-একটি কথা বলিয়াই সৌরজগতের, বিশেষতঃ পৃথিবীর উৎপত্তি বিষয়ে, বিভিন্ন পণ্ডিতগণের গভীর গবেষণার ফলে কি কি খবর আজ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে তাহারই আলোচনা করা হইবে।

পৃথিবীকে সচরাচর কমলালেবুর সঙ্গে তুলনা করা হইয়া থাকে। কমলালেবুর খোসা যেমন উহার বাহিরের সীমা, তেমনি পৃথিবীর উপরদিকের

সীমাও তাহার জল এবং স্থলভাগকেই হয়ত তোমরা অনেকে মনে করিবে। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। এই জল ও স্থলের উপরিভাগ অর্থাৎ সারা
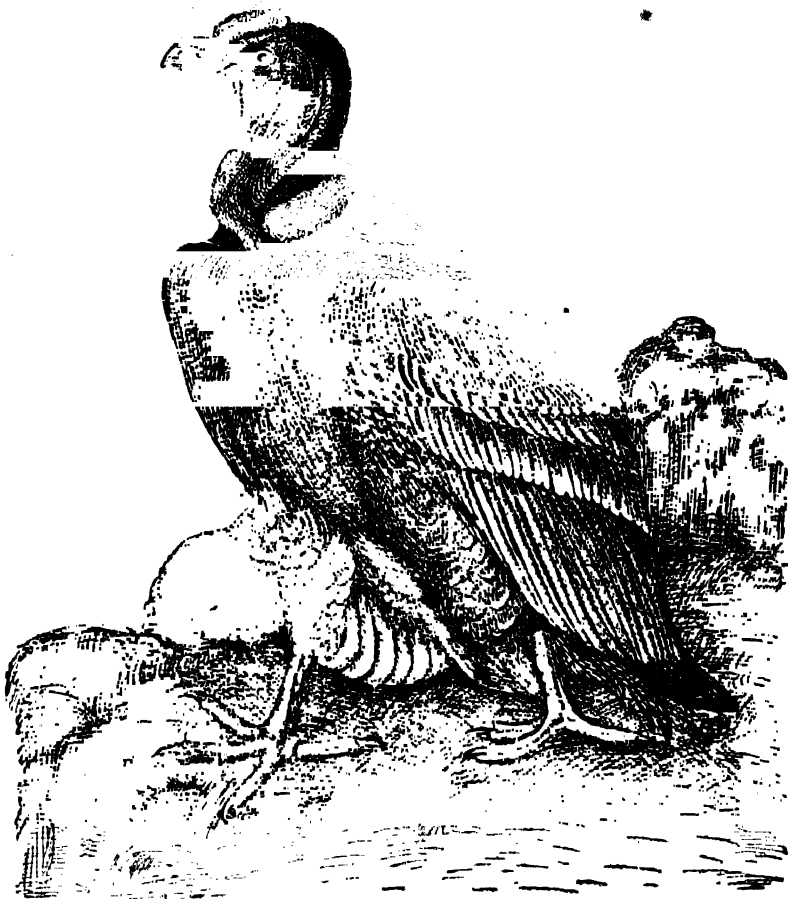
কনডোর (Condor) পাখী

(শকুনজাতীয় পাখীর মধ্যে ইহা আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহারা পর্ব্বতের চূড়ায় বাসা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে।)

পৃথিবী, সকলদিকে প্রায় একশত মাইল গভীর বায়ুসমুদ্রে আবৃত। এই বায়ু পৃথিবী হইতে মোটেই পৃথক্ নহে, বরং পৃথিবীর বাহিরের অংশ বা

আবরণ রূপে অবস্থিত। পৃথিবী যেমন হেলানভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে এই বায়ুরাশিও তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকে। গভীর সমুদ্রবাসী জলচর প্রাণী যেমন সমুদ্রের তলদেশে চলাফেরা করে, আমরাও তেমনি এই গভীর বায়ুসমুদ্রের নীচে বিচরণ করিতেছি। গভীর সমুদ্রের তলে যে সকল প্রাণী বাস করে তাহারা কখনও সমুদ্রের উপরিভাগে আসিয়া বাঁচিতে পারে না। তেমনি এই বায়ুসমুদ্রের বেশী উপরে উঠিয়া আমরাও জীবিত থাকিতে পারি না। ব্যোমযানের সাহায্যে মানুষ যত উপরদিকে উঠিতে থাকে বায়ু ক্রমশঃ ততই পাতলা ও ঠাণ্ডা বোধ হইতে থাকে। বেশী উপরে উঠিলে শ্বাসকষ্ট ও শীতকষ্ট উপস্থিত হয়। বিশ মাইলের উপরে নামমাত্র বাতাস থাকে। মাটি হইতে চারি মাইলের উপরে কোন পাখীই উড়িতে পারে না। একমাত্র কনডোর (Condor) নামক শকুনজাতীয় পাখী অতিকষ্টে চারি মাইল উপর পর্য্যন্ত উড়িতে পারে বলিয়া শুনা যায়। ব্যোমযানে চড়িয়া মানুষ সাত মাইল উপর পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, কিন্তু তাহাতে যথেষ্ট শারীরিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

পৃথিবীর জন্মকথা

প্রহেলিকার অন্তরালে,
নানা মতের ছড়াছড়ি
তাই ত হ'ল কালে কালে।

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞানী পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এরূপ মতভেদ হওয়ার যে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে তাহা তোমরাও বুঝিতে পার। পৃথিবীর উৎপত্তি যাহা কেহ কখনও দেখে নাই এবং যাহা দেখিবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা ছিল না, সে বিষয় নির্দ্ধারণে যে মতভেদ হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু মনে

রাখিও যে, তাঁহাদের কাহারও মত যেমন একেবারে ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরা যায় না, তেমনি আবার কাহারও মত নিতান্ত অযৌক্তিকও বলা চলে না। কেননা তাঁহারা প্রত্যেকেই এবিষয়ে বিশেষ জ্ঞানী এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মত কোন না কোন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এসম্বন্ধে যে সকল মত আজ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, তাহাদের সকলগুলি এখানে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। আর হয়ত তাহা তোমাদের ভালও লাগিবে না। তাহাদের মধ্যে একটি মত অনুযায়ী নীহারিকা নামক একপ্রকার বাষ্পীয় পদার্থই পৃথিবীর, এমন কি সমস্ত সৌরজগতের, মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

অন্য আর একটি মত, যাহার কথা এই সঙ্গে উল্লেখ করা হয়, তাহাকে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিলেও চলে। সেই মতে পৃথিবীর গঠনের ধারা ভিন্ন রকমের। তাহাতে পৃথিবী প্রথম অবস্থায় আকারে ছোট এবং শীতল ছিল। পৃথিবীর আকর্ষণে চতুর্দ্দিক হইতে উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর নানা পদার্থ ছুটিয়া আসিয়া উহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এজন্যই ছোট বড় নানা আকারের উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর উপর এখনও পতিত হইতে দেখা যায়। উহাতে পৃথিবীর আকার যেমন দিন দিন বড় হইতেছে তেমনি এই সকল পদার্থের চাপে পৃথিবীর উত্তাপও ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। পৃথিবীর বায়ু যাহা পূর্ব্বে হাল্কা ছিল তাহা ক্রমশঃ ঘন হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবী কোন সময়েই সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হয় নাই কিংবা পৃথিবীর বাহিরের আবরণ বা স্তর বলিয়া কোন কিছু ছিল না। পূর্ব্ব মতের সঙ্গে এই মতের যে কত বড় পার্থক্য, তাহা ইহার পর আরও ভালরূপে বুঝিতে পারিবে।

এই উভয় মতের আলোচনা করিলে নীহারিকা হইতে সৌরজগতের উৎপত্তির কথাই অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এখন নীহারিকা হইতে কিরূপ ভাবে সৌরজগৎ, এবং সৌরজগতে পৃথিবীর উৎপত্তি সম্ভবপর হইল, তাহাই বুঝিবার বিষয়।

ঘুরে বেড়ান সূর্য্যি ঠাকুর
সঙ্গে গ্রহের দল,
আবির্ভাব যে হ'ল তাদের
কোন্ কারণের ফল ?

সূর্য্য এবং সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ আজ অনন্ত আকাশে নিজেদের নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের আবির্ভাব যে কিরূপে হইল তাহা নির্দ্ধারণ করা যে খুব সহজ বিষয় নয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবে; কিন্তু তাই বলিয়া উহা জানিবার কিংবা বুঝিবার কোন উপায় নাই তাহা মনে করা নিতান্ত ভুল। মানুষের শক্তি অসাধারণ। সেই শক্তিবলে কাল যাহা অসম্ভব ছিল আজ তাহা সম্ভব হইতেছে। ব্যোমযানে আকাশ-ভ্রমণ, যাহা কিছুদিন পূর্ব্বেও মাত্র কল্পনার বিষয় ছিল, আজ তাহা মানুষের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে সম্ভবপর হইয়াছে। মানুষের এই শক্তির পরিচয়, তোমরা চিন্তা করিলে অনেক বিষয়েই দেখিতে পাইবে। সেই শক্তি-বলেই জ্ঞানী পণ্ডিতগণ খতত্ত্বের বহু বিষয় আজ জানিতে পারিয়াছেন এবং সাধারণেরও বুঝিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে, আকাশতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ, অনন্ত আকাশের বিভিন্ন স্থানে, পৃথিবীর মত বহু নূতন গ্রহের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহা হইতে তাঁহারা পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির উৎপত্তি বিষয়েও একপ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এখন তোমরা বলিতে পার যে, পৃথিবী গঠিত হইতে যদি কোটি কোটি বৎসর সময় লাগিয়া থাকে, তবে যে কোন গ্রহের উৎপত্তি হইতে তাহার পূর্ণ গঠন লক্ষ্য করা, দুই-চারিজনের দ্বারা ত দূরের কথা, শত শত লোকের জীবনব্যাপী দর্শনেও শেষ হইবে কিনা সন্দেহ! তারপর যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র মাত্র কয়েক শত বৎসর হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদ্বারা এই অল্প সময়ের মধ্যে, একটি নূতন গ্রহের

উৎপত্তি এবং গঠন লক্ষ্য করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ইহা যে নিতান্ত অসম্ভব নহে, তাহা তোমাদিগকে একটি সাধারণ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। তোমরা অনেকেই তোমাদের বাগানে বহু পুরাতন আম, কাঁটাল, তাল প্রভৃতি গাছ দেখিয়াছ। তাহাদের জন্ম হইতে বর্ত্তমান অবস্থা এবং আকার লক্ষ্য করা, তোমাদের ত দূরের কথা, তোমাদের পিতামহ্ অর্থাৎ বাবার বাবাও লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তবুও তোমরা ইহাদের যে কোন একটি গাছের জন্মকথা জান এবং বলিতে পার। কেননা উহাদের বীজ এবং বিভিন্ন আকারের চারা এবং নানা বয়সের গাছ, তোমরা অহরহই দেখিতেছ। সেইরূপ অনন্ত আকাশে নানা বয়সের, নানা আকারের গ্রহ দেখিয়া, একটি গ্রহের উৎপত্তি এবং গঠন বিষয়ের ধারণা করাও কি নিতান্ত অসম্ভব? তারপর যাঁহারা উহাদিগের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন তাঁহারা এসকল বিষয়ে এক একজন প্রবীণ জ্ঞানী। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইবে তাহা তোমরা যাহাতে নিতান্ত প্রলাপ বাক্য মনে না কর তাহার জন্যই এত কথা বলা হইল।

লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে, সেই সুদূর অতীতে এমন একদিন গিয়াছে, যখন সৌরজগতের সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহগণ সকলে একই পদার্থ এবং একই অবস্থায় ছিল। সেই পদার্থের নাম নীহারিকা (Nebula)। এই নীহারিকা কি তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পার নাই। নীহারিকা আলোক-বিকিরণকারী মেঘের ন্যায় পুঞ্জীভূত বাষ্প ছাড়া আর কিছুই নহে। এখনও সহস্র সহস্র নীহারিকা আকাশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে সাধারণতঃ তাহাদিগকে দেখা যায় না। সুতরাং চিনিতে হইলে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য দরকার। এই যন্ত্র আবিষ্কার হওয়াতে নীহারিকা এবং গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি চিনিবার পক্ষে সুবিধা হইয়াছে সত্য, কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র তেমন শক্তিসম্পন্ন না হইলে তাহা

দ্বারাও অনেক সময় নীহারিকাকেই পুঞ্জীভূত নক্ষত্র বলিয়া মনে হয়। কিঞ্চিৎ-অধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বর্ণালীবীক্ষণ (spectroscope) নামক যে একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদ্বারা গ্রহ, নক্ষত্র ও নীহারিকা প্রভৃতির বিষয় বুঝিবার পক্ষে আরও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা প্রভৃতি প্রত্যেকেরই ভিতরে যে কি কি মৌলিক পদার্থ কি ভাবে আছে উহার সাহায্যে তাহা এখন ঠিক করা যায়। সুতরাং— উহাদিগের বিষয় জানিবার পক্ষে এই বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র কতটা যে সাহায্য করিতেছে তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। এই বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে দীর্ঘকাল মনোযোগ সহকারে আকাশে বিভিন্ন অবস্থার নীহারিকা ও গ্রহ-নক্ষত্র দেখিয়া নীহারিকা হইতেই যে পৃথিবীর উৎপত্তি সম্ভবপর তাহা পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন। এখন কি শক্তিবলে নীহারিকা হইতে সূর্য্য ও সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের উৎপত্তি হইল তাহাই এখন তোমাদের বুঝিতে হইবে।

পরস্পরের আকর্ষণে
নীহারিকা নড়ে
মাধ্যাকর্ষণ নামে শক্তি
সৌরজগৎ গড়ে।

তোমাদের সকলেরই একথা জানা আছে যে, সৌরজগতে সূর্য্য হইতে সকলগ্রহ-উপগ্রহই অনবরত ঘুরিতেছে। উহাদের এই আবর্ত্তন নীহারিকা হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। যে নীহারিকা হইতে উহারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রথমতঃ চক্রাকারে ঘুরিতেছিল, পরে তাহাই আবার সর্পিল গতিতে (spiral motion) ঘুরিতে আরম্ভ করে। নীহারিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যে আবর্ত্তন আজ পর্য্যন্ত সৌরজগতে অবিরত চলিতেছে তাহার কারণ কি, তোমরা হয়ত অনেকেই জান না। ইহা অন্ততঃ সকলেই বুঝিতে পারিতেছ যে, আবর্ত্তন

নীহারিকা

(এইরূপ একটি নীহারিকা হইতেই পৃথিবী এবং চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছি ।)

যখন আছে তখন তাহার নিশ্চয়ই একটা কারণও আছে। সেই কারণ যাহা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে তাহার নাম মাধ্যাকর্ষণশক্তি।

এই মাধ্যাকর্ষণশক্তি যে কি, তাহা তোমরা সকলে না জানিলেও ইহার প্রভাব সকলেই অনুভব কর, সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারিবে। সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম অণু পরমাণু হইতে সকল জড় পদার্থই নিজের দিকে পরস্পর পরস্পরকে সজোরে আকর্ষণ করিতেছে। জড় পদার্থের এই আকর্ষণশক্তি তাহাদের গুরুত্ব ও দূরত্ব অনুযায়ী কম বেশী হইয়া থাকে। যে পদার্থ যত ভারী, তাহার এই আকর্ষণশক্তিও তত বেশী। আবার যাহা যত দূরে তাহার আকর্ষণও তত কম। এই আকর্ষণের নামই মাধ্যাকর্ষণশক্তি। তোমরা দোতালা, তেতালা দালান কিংবা এরূপ কোন উঁচু যায়গাতে যখন উঠা-নামা কর তখন এই শক্তির কার্য্য তোমরা সকলেই অনুভব করিতে পার। উঁচু যায়গায় উঠিবার সময় তোমরা যত পরিশ্রম বোধ কর নামিবার সময় যে তত পরিশ্রম বোধ কর না তাহা বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ। ইহার কারণই সেই মাধ্যাকর্ষণ। পৃথিবী ছাড়িয়া উপরদিকে উঠিবার সময় ও নীচের দিকে নামিবার সময় পৃথিবীর এই শক্তি তোমাদিগকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টানিতে থাকে। এই শক্তির প্রতিকূলে যাইতে হয় বলিয়াই উপরে উঠিবার সময় তোমাদিগের কষ্ট হয়। আর নীচে নামিবার সময় এই শক্তি তোমাদের গতির অনুকূলে থাকে, সুতরাং তেমন কষ্ট হয় না। এই যে শক্তি তাহা সমস্ত পদার্থেই ব্যাপিয়া আছে। তাহারই বলে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পরস্পর আকর্ষণের ফলেই নীহারিকা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সকলেরই গতির উৎপত্তি হইয়াছে। নিউটন নামক তোমাদের মতই একটি অল্পবয়স্ক বালক, বৃক্ষ হইতে আপেল ফল পড়িতে দেখিয়া, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহার সেই চেষ্টা ফলবতী হয় এবং তিনি মাধ্যাকর্ষণশক্তি নামক জগতের এই চিরন্তন সত্য আবিষ্কার করেন। তিনি এখন মহাত্মা সার আইজাক নিউটন নামে জগতে পরিচিত।

এই মাধ্যাকর্ষণশক্তির বলেই, নীহারিকা নামক বাষ্পপুঞ্জ হইতে অনবরত আবর্ত্তনের ফলে সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি সৌরজগতের যাহা কিছু গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদির উৎপত্তি হইয়াছে। নিউটনের পর তাঁহারই মতানুলম্বী হার্‌সেল (Herschel) নামক একজন পণ্ডিত বিশেষ শক্তিসম্পন্ন একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাদ্বারা তিনি সারাজীবন অনুসন্ধানের ফলে, আকাশে নানা অবস্থার ও নানা আকারের শত শত নীহারিকা দেখিতে পাইয়াছিলেন। নীহারিকা হইতে ক্রমশঃ গ্রহের উৎপত্তি এবং ধ্বংস সকলই তিনি প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং বর্ত্তমানে যে ভাবে নীহারিকা হইতে গ্রহের উৎপত্তি হইতেছে, অতীতেও যে সেইরূপে সৌরজগতের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা খুব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না কি ?

নিউটন

এই আবর্ত্তিত নীহারিকা, আকাশ পথে ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে, মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া, আকারে ছোট হইয়া আসিল। উহার বাষ্পীয় পদার্থও তখন ক্রমশঃ ঘন হইতে ঘনতর হইতে লাগিল। তোমাদের অনেকেরই ধারণা এই যে, সুদূর আকাশ একদম ফাঁকা, একদম শূন্য—উহাতে কোন পদার্থ নাই। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন যে, উহাতে অসংখ্য ধূলাবালি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের কণা ত আছেই তা ছাড়া বড় বড় পদার্থ—যেমন উল্কা, প্রস্তর প্রভৃতিরও অভাব নাই। তাহারাও সকলেই আবর্ত্তিত হইতেছে। এই আবর্ত্তিত নীহারিকাকেও এই সকল পদার্থের ভিতর দিয়াই পথ চলিতে হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ঘনত্ব ও তদানুষঙ্গিক সঙ্কোচন জন্যও উহার তাপ বাড়িতেছিল। এই সকল কারণে নীহারিকা ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। এইরূপে হাজার হাজার বৎসরের অবিরাম ঘর্ষণ

ও সঙ্কোচনে উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া সেই নীহারিকাই ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিল এবং আলোকবিকিরণের ক্ষমতা লাভ করিল। কালক্রমে তাহাই সূর্য্যরূপী জ্বলন্ত অগ্নিগোলকে পরিণত হইল।

মাধ্যাকর্ষণের দরুণ একটি গ্রহ অন্য আর একটি গ্রহকে সজোরে আকর্ষণ করিতেছে, ইহা তোমরা জান। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই আকর্ষণের ফলে, ছোট একটি গ্রহ, অন্য বৃহদাকার গ্রহের দিকে ছুটিয়া গিয়া ধাক্কা লাগিবে কিনা? তাহার সম্ভাবনা যে নাই তাহা নহে। বরং এরূপ ঘটনা মাঝে মাঝে খুব সম্ভব ঘটিয়া থাকে। এরূপ আঘাতে কিংবা ঘর্ষণের ফলে কি দাঁড়াইবে, তাহাই এখন ভাবিবার বিষয়। তাহাদের পরস্পর আকর্ষণে কিংবা আঘাতে প্রবল উত্তাপের সৃষ্টি হইবেই। এখন সেই উত্তাপের মাত্রা যদি বেশী হয়, তবে সম্ভব দুইটি গ্রহ পুনরায় নীহারিকাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে! সময় সময় কোন নূতন নক্ষত্রকে হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া উজ্জ্বলতর হইতে দেখা গিয়া থাকে। ইহা যে এরূপ কোন আঘাত কিংবা ঘর্ষণের ফল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সৌরজগতে কিন্তু সকল গ্রহেরই একাধিক আকর্ষণ থাকাতে তাহারা সকলেই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিতেছে এবং তাহাদের পরস্পরে এরূপ কোন আঘাত লাগে না।

> আবর্ত্তিত সূর্য্য হ'তে
> উল্কা হেন ছুটি'
> পৃথ্বী আদি গ্রহ যত
> উঠ্‌ল ক্রমে ফুটি।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে, সূর্য্য কিরূপে একটি আবর্ত্তিত অগ্নিগোলকের আকার ধারণ করিল তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। এখন খতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ নানারূপ অনুসন্ধান এবং গবেষণার দ্বারা পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহারই

আলোচনা করা যাউক। সেই কল্পনাতীত যুগে, সূর্য্যের ভিতরকার জ্বলন্ত পদার্থগুলি জমাট বাঁধিয়া প্রথমেই আলোক ও উত্তাপের কেন্দ্ররূপে পরিণত হয় নাই। বর্ত্তমানে উহার যে আকার, প্রথমতঃ তাহা বহুগুণে বড় ছিল এবং উহার আবর্ত্তনের ফলে, উহার সকল দিক হইতেই খণ্ডে খণ্ডে বহু অংশ অবিরত বিচ্ছুরিত হইতেছিল। সেই খণ্ডগুলি হইতেই সৌরজগতে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে। সূর্য্য হইতে বিচ্যুত যে উজ্জ্বল জ্বলন্ত পদার্থ পৃথিবীতে পরিণত হইয়াছে তাহাও পরে আবার দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে যেইটি বেশ বড় ছিল তাহা হইতেই আমাদের পৃথিবী গঠিত হইয়াছে। অন্য ক্ষুদ্র অংশটি হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

বিগত ভারতীয় বিজ্ঞান মহাসভার জুবিলী অধিবেশনের সভাপতি মনস্বী পণ্ডিত জিন্স্ (Jeans), পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তির কথা তিনিও স্বীকার কারয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি একটি আকস্মিক ঘটনার ফল। সেই আকস্মিক ঘটনা যদি না ঘটিত তবে পৃথিবীর উৎপত্তি কখনও সম্ভবপর হইত না।

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যের আকার বর্ত্তমান আকারের চাইতে বহুগুণে বড় ছিল। সেই সুদূর অতীতে, তখনকার সূর্য্য হইতে কোটি কোটি গুণে বড় একটি বিরাট তারকা, সূর্য্যের নিকট দিয়া যখন তাহার গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতেছিল, আমাদের পৃথিবী এবং সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের উৎপত্তির কারণ তখনই উদ্ভব হইয়াছিল। জিন্সের মতে কিরূপে ইহা সম্ভবপর হইল তাহাই এখন বুঝিতে হইবে।

চন্দ্র যখন পৃথিবীর কাছে আসে তখন সমুদ্রের জল চন্দ্রের আকর্ষণে উপর দিকে ফুলিয়া উঠে। পূর্ব্বোক্ত বিরাট তারকা যখন সূর্য্যের উপর উপস্থিত হইয়াছিল, তখন সূর্য্যের চারিদিকের জ্বলন্ত গ্যাসীয় পদার্থ উহার আকর্ষণে এক বিরাট পর্ব্বতের আকারে সেই তারকার দিকে উত্থিত হইল। উহা যে কত বড় তাহা ধারণা করাই এক দুরূহ ব্যাপার। কেননা পৃথিবী এবং সৌরজগতের

অন্যান্য গ্রহ উহা হইতেই গঠিত হইয়াছিল। এখন একবার ভাবিয়া দেখ তাহা কত বড়! উহার বহু সহস্র মাইল উৰ্দ্ধ চূড়া পূর্ব্বোক্ত তারকার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। তারাটি সূর্য্যের যতই নিকটে আসিতেছিল, এই পর্ব্বতের আকার ততই বৃদ্ধি হইতেছিল। তারপর এমন সময় আসিল যখন এই গ্যাসীয় পর্ব্বত সূর্য্য হইতে একেবারে পৃথক্ হইয়া গেল। সেই বিরাট তারকা সূর্য্য হইতে যখন দূরে চলিয়া গেল, সেই গ্যাসীয় পর্ব্বতের উপর উহার আকর্ষণও তখন কমিয়া প্রায় লোপ পাইয়া গেল। সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন সেই আগুনের উৎস আকাশে ভাসিতেছিল। উহার আকার তখন কতকটা পটোলের মত দুই দিকে ক্রমশঃ সরু ও মধ্যভাগে বেশ মোটা ছিল।

শীতল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ঘনীভূত হইয়া যেমন পৃথক্ পৃথক্ জলকণার উৎপত্তি হয়, তেমনি উহা হইতে, পরস্পর পৃথক্ কতকগুলি আগুনের গোলক গঠিত হইয়াছিল। মোটা মধ্যভাগের গোলকগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার ধারণ করিল। প্রান্তভাগের গোলাগুলি ক্রমশঃ ছোট আকারে গঠিত হইল। অবশেষে সেই গোলকগুলি পরস্পর পৃথক্ হইয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা পুনরায় সূর্য্যের সঙ্গে আর মিশিয়া যাইতে পারে নাই। এখন তাহারা প্রায় চক্রাকার পথেই সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করে; কিন্তু প্রথম হইতেই তাহাদের গতিপথ এরূপ সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই। উহারা প্রত্যেকেই ক্রমশঃ শীতল ও সঙ্কুচিত হইয়া এক একটি গ্রহে পরিণত হইয়াছে এবং উহাদের বর্ত্তমান গতিপথও ক্রমশঃ সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমাদের পৃথিবী উহাদেরই একটি গ্রহ। পণ্ডিতপ্রবর জিন্‌সের মতে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি এরূপভাবেই সম্ভবপর হইয়াছে।

সূর্য্য হইতে যখন পৃথিবীর উৎপত্তি হইল তখন বুঝিতেই পারিতেছ যে, উহা প্রথমতঃ মস্ত বড় আবর্ত্তিত জ্বলন্ত গোলকরূপে দেখা দিয়াছিল। বর্ত্তমানে জল, বায়ু, বাষ্প, মাটি, পর্ব্বত, প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের সকলেরই অণু-পরমাণু এই আবর্ত্তিত জ্বলন্ত গোলকে

বাষ্পের আকারে নিহিত ছিল। সূর্য্যমণ্ডলে পৃথিবীস্থ বহু উপাদান বাষ্পাকারে বর্ত্তমান আছে, বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে উহা পরীক্ষিত হইয়াছে। কালক্রমে এই বাষ্প ক্রমশঃ শীতল হইয়া পৃথিবীর বর্ত্তমান আকার গঠিত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে জল, মাটি ইত্যাদিও উহাদের নিজেদের এখন যা আকার তাহা লাভ করিয়াছে। যে কোন কঠিন পদার্থ ক্রমাগত গরম করিতে থাকিলে এখনও তাহা বাষ্পের আকার ধারণ করে। জিনিষভেদে উত্তাপ দিবার সময়ের ও উত্তাপের পরিমাণের ইতরবিশেষ হইলেও পরিশেষে কোন জিনিসই বাষ্প না হইয়া যায় না। সুতরাং উহারা যে সকলেই এক সময়ে বাষ্পের আকারে ছিল তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

পৃথিবী যখন উত্তপ্ত বাষ্পের গোলকরূপে বর্ত্তমান ছিল তখন উহা একটি ক্ষুদ্র সূর্য্যের মত উত্তাপ ও আলোক বিকিরণ করিত। তারপর ক্রমাগত এই উত্তাপ ও আলোক বিকিরণের ফলে পৃথিবীর উত্তাপের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। পৃথিবীর নানা উপাদান তখন জমিয়া তরল মণ্ডের আকারে পরিবর্ত্তিত হইল। বাষ্প ঠাণ্ডা হইলেই যে জমিয়া জল হয় তাহা তোমরা অনেক সময়ই দেখিয়া থাক। সুতরাং পৃথিবীর সেই আদি বাষ্প যে ক্রমশঃ শীতল হইয়া তরল পদার্থে পরিণত হইয়াছিল তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

এখন ক্রমাগত উত্তাপ ও আলোক বিকিরণের ফলে পৃথিবী শীতল হওয়াও যে সম্ভবপর তাহা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। একখণ্ড লৌহ-শলাকা বেশীক্ষণ আগুনে পোড়াইলে তাহা যে ঘোর রক্তবর্ণ ধারণ করে তাহা তোমরা বোধ হয় সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছ। এরূপ একটি উত্তপ্ত লৌহখণ্ড অন্ধকার গৃহে নিলেই উহা যে আলোক বিকিরণ করিতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে। সেই লাল লৌহখণ্ড অচিরেই কাল হইয়া যায়। আলোক বিকিরণ বন্ধ হইলেও সেই লৌহখণ্ড প্রথমতঃ বেশ গরম থাকে, তারপর ক্রমশঃ শীতল হইয়া শুধু ঠাণ্ডা লৌহখণ্ডই রহিয়া যায়। তাহা

হইলেই বুঝিতে পারিতেছ যে, যদিও একদিন পৃথিবীরও সূর্য্যের ন্যায় আলোক-দানের ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তাহা অবিরত আলোক ও উত্তাপ বিকিরণের ফলে ক্রমশঃ শীতল হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে শীতল হইয়া পৃথিবীর উপরিভাগ যখন কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছিল তখনও উহার ভিতর অপরিসীম উত্তপ্ত গ্যাসই রহিয়া গেল। পৃথিবীর যে সকল পদার্থ জমিয়া ক্রমশঃ তরল ও ওজনে ভারী হইতে লাগিল, তাহা আবার ভিতরের দিকে, অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে গিয়া জমা হইতেছিল। বায়ুর মত যে সকল পদার্থ জমিয়া তরল কিংবা ভারী হয় নাই তাহা সেই পূর্ব্বের মত এখনও পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে। তখনকার পৃথিবীর অবস্থাটা একবার কল্পনা-চক্ষে ভাবিয়া দেখ। পৃথিবীর অভ্যন্তরে কেন্দ্রের দিকে উত্তপ্ত গ্যাস, তাহার উপর তরল পদার্থের আবরণ, সেই আবরণের বাহিরে শীতল বাষ্প অথবা বায়ু।

যুগ-যুগান্তর অতীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পৃথিবীর এই অবস্থারও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সেই জলের মত তরল পদার্থ অল্পে অল্পে ঘন হইয়া কঠিন পদার্থে পরিণত হইল। উহা প্রথমতঃ হয়ত তৈলের মত ঘন হইয়াছিল, তারপর তাহার চেয়ে আরও ঘন, এইরূপে ক্রমে ঘন হইতে ঘনতর হইয়া কঠিন হইয়া গেল। তোমরা সব সময়ই মনে রাখিবে যে, পৃথিবীতে যখন এই পরিবর্ত্তন চলিতেছিল তখনও উহা মুহূর্ত্তের জন্য স্থির থাকিতে পারে নাই। অনবরত লাটিমের মত ঘুরিতে ঘুরিতে উহা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছিল আর সূর্য্য তখন উহাকে মাধ্যাকর্ষণের বলে নিজের দিকে সজোরে আকর্ষণ করিতেছিল। তোমরা হয়ত মনে করিবে যে, এই আকর্ষণে পৃথিবীর জলীয় পদার্থ অংশতঃ সূর্য্যের দিকে ছুটিয়া গিয়াছিল; না হয় অন্ততঃ সেদিক খুবই উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবিক কিন্তু সেরূপ কিছুই হয় নাই। কারণ পৃথিবীর অবিরাম আবর্ত্তনের দরুণ পৃথিবীর কোনদিকই বেশী সময়ের জন্য সূর্য্যের দিকে থাকিতে পারে নাই। তাহাতে সেই আকর্ষণও পৃথিবীর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের উপর তেমন ভাবে কার্য্যকরী হয় নাই। ফলে শুধু একটা

প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হইত, যাহাতে পৃথিবীপৃষ্ঠ প্লাবিত করিয়া ফেলিত। চন্দ্র-সূর্য্যের এই আকর্ষণের দরুণই সমুদ্রে এখনও তোমরা জোয়ার আসিতে দেখ। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম যে জোয়ার আসিয়াছিল তাহা শীতল জলের স্রোত না হইয়া, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ উত্তপ্ত রক্তবর্ণ গলিত ধাতব পদার্থের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। উহা আগ্নেয়গিরির মুখ হইতে বাহির হইয়া ঠাণ্ডা এবং জমিয়া কঠিন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবল স্রোতের বেগে পৃথিবীকে ভাসাইয়া দিয়াছিল। শীতল হইয়া এই স্রোতই পরে পাথরের কঠিন স্তরে পরিণত হইল। পৃথিবীতে জলময় সমুদ্রের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই এই স্তরের উৎপত্তি হইয়াছিল। সে সময় পৃথিবীর উপরিভাগ এতই উত্তপ্ত ছিল যে, তখন সমুদ্রের এই অপরিসীম জলরাশি বাষ্প হইয়া সর্ব্বদাই বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া থাকিত। সুদূর আকাশের মেঘ-পরিপূর্ণ বায়ু হইতে সে সময় গরম জলের বৃষ্টি হইত সত্য, কিন্তু তাহা পৃথিবী পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারিত না। কেননা তাহা পৃথিবীর সেই ভীষণ উত্তপ্ত স্তর স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই পুনরায় বাষ্পের আকার ধারণ করিত। সেই স্তরই কালক্রমে কঠিন হইয়া আদি স্তর (Fundamental gneiss) রূপে পরিণত হইল।

বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে পৃথিবীর এই অবস্থাতেই পৃথিবী হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। পৃথিবীর আবর্ত্তনের সময় এই সকল ধাতব পদার্থ মাধ্যাকর্ষণের জোরে পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তাহা হইতেই চন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে। পৃথিবী হইতে এই গলিত পদার্থ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়াতে যে গর্ত্তের সৃষ্টি হইল, কাহারও কাহারও মতে তাহাই কালক্রমে জলে পরিপূর্ণ হইয়া সাগরের আকার ধারণ করিয়াছে। অবশ্য গর্ত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে উহা জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল তাহা নহে। কারণ সে সময় বাষ্প জমিয়া জল হওয়ার মত অবস্থা ছিল না। এই বিচ্ছিন্ন গলিত ধাতব পদার্থের কি গতি হইল এখন তাহাই দেখা যাক্। প্রথমতঃ উহার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কোন আকারই ছিল না;

কিন্তু পৃথক্ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহা ঘুরিতেছিল, পরে ক্রমশঃ শীতল হইতে লাগিল। এই সময় উহার সকল অংশ পরস্পর পরস্পরকে ভিতরের দিকে আকর্ষণ করাতে উহা ক্রমশঃ গোল আকার ধারণ করিল। তখন চন্দ্র পৃথিবীর খুব নিকটে ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। তবুও চন্দ্রই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী গ্রহ।

ধরাপৃষ্ঠ আঁকা-বাঁকা বিচিত্র গঠন,
ক্রমে পরে দেখা দিল দৃঢ় আবরণ।

চন্দ্রের উৎপত্তি হওয়ার পরেও পৃথিবীর উত্তাপ ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছিল। এমন কি এখন পর্য্যন্তও সেই উত্তাপহ্রাসের কার্য্য চলিতেছে। তারপর এমন এক সময় আসিল যখন পৃথিবীর উপর এক কঠিন আবরণই দেখা দিল। সম্ভবতঃ সে সময়কার উত্তাপ এবং চাপের ফলেই এই আবরণ গঠিত হইয়াছিল। পৃথিবীর যে অংশে সমুদ্র রহিয়াছে, তোমরা হয়ত মনে করিবে যে, সেখানে এই আদি স্তর ভাঙ্গিয়া গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। শুধু ভূভাগেই যে উহা বর্ত্তমান আছে তাহা কিন্তু ঠিক নয়। এই যে আদি স্তর উহা যেমন পৃথিবীর ভূভাগে আছে তেমনি সমুদ্রের তলাতেও আছে। তবে সমুদ্রের স্থানে স্থানে গভীরতার ইতরবিশেষে কোথাও বা উহা পুরু, আর কোথাও বা উহা সরু। সমুদ্রের যে স্থান সর্ব্বাপেক্ষা গভীর সে স্থানেই উহা সব চাইতে সরু, আর সমুদ্র যেখানে সব চাইতে অগভীর সেইখানেই এই স্তর বেশী পুরু রহিয়াছে। কিন্তু সমুদ্রতলে উহা এখনও বিদ্যমান আছে, কোথাও আলাদা অথবা পৃথক্ হইয়া যায় নাই। গলিত প্রস্তর হইতে প্রস্তুত পৃথিবীর এই আদি আবরণ, ক্রমশঃ অল্পে অল্পে নিয়মিতভাবে শীতল হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। তাই বলিয়া কিন্তু উহা সম্পূর্ণ সমতলভাবে গঠিত হইতে পারে নাই। কেননা পৃথিবী যখন এইভাবে ক্রমশঃ শীতল হইতেছিল তখন

অন্যান্য কারণও ছিল যাহার জন্য ধরাপৃষ্ঠ সম্পুর্ণ সমতল হওয়ার পক্ষে
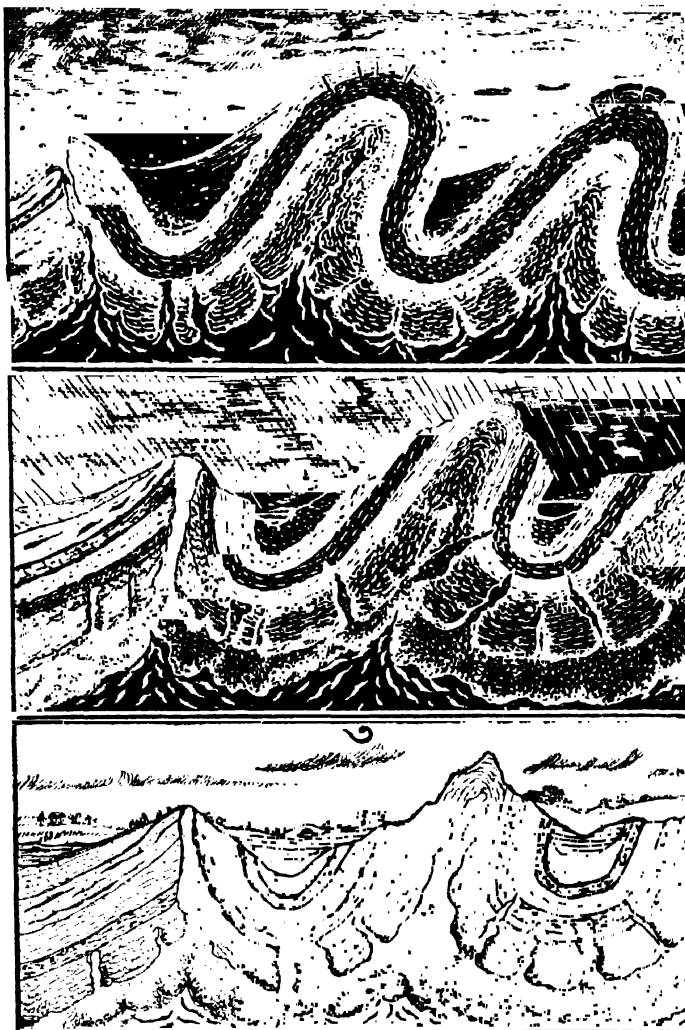
পৃথিবীর স্তর গঠনের তিন অবস্থা

যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, ফলে খুবই আঁকা-বাঁকা হইয়া গিয়াছিল

এই পরিবর্ত্তন যে সব সময়ে একই কারণে হইয়াছিল তাহা নহে। কোন যুগে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ ভীষণ উত্তাপই হয়ত ইহার কারণ। আবার কোন যুগে জলস্রোতই হয়ত ইহার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তন কি ভাবে হইয়াছিল তাহা বুঝিবার সুবিধার জন্য, পূর্ব্বপৃষ্ঠায় পৃথিবীর তৎকালীন স্তরের আনুমানিক আকার ও ক্রমপরিবর্ত্তন তিনটি ছবি দ্বারা দেখান হইল। ইহা হইতে তোমরা সে সময়কার ধরাপৃষ্ঠের ক্রমপরিবর্ত্তন অনুমান করিতে পারিবে।

প্রথম ছবিতে পৃথিবীর সেই প্রস্তর গঠিত স্তর, কি ভীষণভাবে ঢেউ-খেলান আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা দেখান হইয়াছে। পৃথিবীর উত্তপ্ত গলিত ধাতব পদার্থ, স্থানে স্থানে সেই স্তর বিদীর্ণ করিয়া যে সবলে বাহির হইয়া স্তরের উপর জমা হইতেছে, তাহাও এই ছবিতে দেখিতে পাইবে। দ্বিতীয় ছবিতে লক্ষ লক্ষ বৎসরের জল-ঝড়, তুষার ও নদীস্রোতে কিরূপ ভাবে সেই পাথরের ঢেউএর উপরিভাগ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে তাহা দেখান হইয়াছে। তাহাতে একদিকে যেমন উহাদের উপরিভাগ উঁচু-নীচু হইয়া পাহাড়-পর্ব্বতের সৃষ্টি হইয়াছে তেমনি আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল ক্ষয়প্রাপ্ত ধূলিকণা ইত্যাদিতে নীচের দিকের গর্ত্তগুলিও ক্রমশঃ ভর্ত্তি হইয়া স্তরের উপর স্তর গঠিত হইয়াছে। পৃথিবীর স্তরের এই পরিবর্ত্তন ও গঠনের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ গাছপালা ও জীবজন্তুর আবির্ভাব এবং ধ্বংস হইতেছিল। তৃতীয় ছবিতে, সেই স্তরগুলিই বর্ত্তমানে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া, পাহাড়-পর্ব্বত জলস্থল দ্বারা বেষ্টিত পৃথিবীতে কি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা দেখান হইয়াছে। এই তিনটি ছবিতে পৃথিবীর স্তরের যে ক্রমিক পরিবর্ত্তন দেখান হইল তাহা একশত কি দুইশত বৎসরের কথা নহে—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসরের পরিবর্ত্তনের ফল।

যে সকল শক্তি ধরাপৃষ্ঠ গঠন করিতেছে তাহাদের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিই প্রধান শক্তি। মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাবে পৃথিবী ভিতরের দিকে

অবিরতই সঙ্কুচিত হইতেছে। তাহাতে স্থানে স্থানে পৃথিবীর উপরিভাগ ভিতর দিকে ধ্বসিয়া পড়ে এবং ভূপৃষ্ঠের নানারূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। আজ যাহা সমতল ভূভাগ, কে জানে তাহাই যে একদিন নীচের দিকে ধ্বসিয়া গিয়া গভীর সমুদ্রতলে পরিণত হইয়া যাইবে না। উত্তাপ ও জলস্রোত যে ধরাপৃষ্ঠ পরিবর্ত্তিত হওয়ার আরও অন্য দুইটি প্রধান কারণ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এ ছাড়া বায়ুস্রোত প্রভৃতি অন্যান্য কারণ পৃথিবীর স্থানে স্থানে আকার পরিবর্ত্তনের যথেষ্ট সাহায্য করে।

বহুকাল য্যাবৎ মানুষের একটা ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর যত কিছু পরিবর্ত্তন সকলই এক-একটি খণ্ডপ্রলয়ের ফল। পৃথিবী একই ভাবে হয়ত বহু যুগ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, হঠাৎ এরূপ একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে সমস্ত একেবারে উলট-পালট করিয়া দিয়া গেল; ধরাপৃষ্ঠ নূতন আকার ধারণ করিল। এরূপ ঘটনা সচরাচর না ঘটিলেও মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে, যাহার কথা মানুষ সহজে ভুলিতে পারে না। পৃথিবী ক্রমশঃ শীতল হইয়া বর্ত্তমানে যে অবস্থাতে উপনীত হইয়াছে, তাহাতেও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ছোট-বড় ভূমিকম্প অনেক সময়ই দেখা যায়। সুতরাং মানুষের এই যে ধারণা তাহা নিতান্ত কাল্পনিক একথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তোমরা সর্ব্বদাই মনে রাখিবে যে, এই সকল খণ্ডপ্রলয়ে ভূপৃষ্ঠের যত না পরিবর্ত্তন করে, তাহার চেয়ে ধীরে ধীরে অবিরাম যে সামান্য পরিবর্ত্তন চলিতে থাকে, তাহাতেই অনন্যসাধারণ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। তবে বিশেষ লক্ষ্য না করিলে চক্ষে পড়ে না।

বিন্দুপরিমাণ বীজ হইতে একটি বটবৃক্ষের চারা উৎপন্ন হইয়া বৎসরের পর বৎসর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কালক্রমে ইহা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়। জন্ম হইতেই যে ইহা প্রত্যহ একটু একটু করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে-ছিল কয়জনে তাহা লক্ষ্য করে? কিন্তু সেই বৃক্ষকে যদি একটা প্রবল ঝড়ে উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দেয়, তখন তাহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং

সেই ঝড়ের কথা এবং বৃক্ষের সেই অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা, সকলেরই মনে থাকে। একটি বিন্দুপরিমাণ বীজ হইতে, একশত বৎসরে হয়ত একটি বিশাল বটবৃক্ষের উৎপত্তি হইল, কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন যে কত বড়, তাহা তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ কি ? সেইরূপ ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্ত্তন হয় সত্য, কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী অবিরাম বিন্দু বিন্দু জলপতনে ভূপৃষ্ঠের যেই পরিবর্ত্তন হয় তাহার সঙ্গে উহার তুলনাই হয় না।

সে আবরণ হইল পুরু
সত্য অতিশয়,
ধরার দেহের অনুপাতে
তাহাও কিছু নয়।

পৃথিবীর যে স্তর বা আবরণের উপর আমরা বাস করিতেছি, তাহা বর্ত্তমানে যথেষ্ট পুরু হইলেও, ধরার বিশাল দেহের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। একটি মস্তবড় জলপূর্ণ তরমুজ কাগজ দ্বারা মোড়াইয়া রাখিলে, তরমুজের তুলনায় কাগজের আবরণ যতটুকু পুরু বলিয়া মনে হইবে, পৃথিবীর এই আবরণও ভিতরকার আগ্নেয় হ্রদের তুলনায় প্রায় তদ্রূপ পুরুই হইবে। তাই বলিয়া এই আবরণ পঞ্চাশ মাইলের কম পুরু হইবে না। লক্ষ লক্ষ মণ জিনিস বহন করিলেও উহা ভিতরদিকে ভাঙ্গিয়া যায় না, তাহাও তোমরা সকলেই দেখিতেছ। কত বিশাল বিশাল প্রাসাদ, পাহাড়-পর্ব্বত যে অবিচলিতভাবে উহার উপর দণ্ডায়মান আছে তাহার অন্ত নাই। জাপানী কাগজের ফানুশের উপর কখনও মশামাছি বা বড় বড় পোকা ইত্যাদি বসিয়া থাকিলে যেমন উহার কাগজের আবরণ একটুও হেলিয়া পড়ে না, সেইরূপ পৃথিবীর উপরও প্রাসাদ ও পাহাড়-পর্ব্বত দণ্ডায়মান থাকাতে তাহার এই আবরণের কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

আমরা যদি পৃথিবীকে কমলালেবুর মত দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি, তবে ইহাতে কি দেখিতে পাইব তাহাই একবার ভাবিয়া দেখ। পৃথিবীর ভিতরে কি যে ভীষণ রকমের উত্তাপ নিহিত আছে, পৃথিবীর উপর হইতে তাহার একটা ধারণাই করা যায় না। যে সূর্য্য হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে তাহার নিকট পর্য্যন্ত মানুষের যাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে হয়ত ইহার কোনরূপ একটা ধারণা করা সম্ভবপর হইত। কোন কালেই কিন্তু তাহার সম্ভাবনা নাই। সূর্য্য হইতে পৃথিবী এত দূরে অবস্থিত যে, মানুষের উদ্ভাবিত সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী যানে চড়িয়াও কেহ তাহার জীবিত কালের মধ্যে সূর্য্য পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবে না। রাস্তার মাত্র কতক অংশ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তাহার আয়ু এক শত বৎসর শেষ হইয়া যাইবে। তারপর সূর্য্য হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত যদিই বা যাতায়াতের কোন উপায় হয়, তবুও কেহ সূর্য্যের নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবে না। কেননা সূর্য্যের কাছাকাছি যাওয়ার পূর্ব্বেই প্রবল উত্তাপে যানবাহন-সমেত মানুষ একেবারে বাষ্প হইয়া যাইবে; মানুষ বলিয়া তাহার কোন অস্তিত্বই থাকিবে না। এখন তোমরা যদি বল যে, পৃথিবী খনন করিয়া ভিতরের অবস্থা দেখার পক্ষে অসুবিধা কি? ইহাতেও সেই একই রকমের বিপদ উপস্থিত হইবে। ভূগর্ভ খনন করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে যে গরম বোধ হয়, তাহা তোমরা কখনও কয়লার খনিতে প্রবেশ করিলেই অনুভব করিতে পারিবে। পৃথিবীতে গভীর গর্ত্ত করিলে সময় সময় আগ্নেয়গিরির উষ্ণ গলিত ধাতব পদার্থের প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেই পৃথিবীর ভিতরে যে কি ভীষণ উত্তাপ নিহিত আছে তাহা বুঝা যায়। সেই উত্তাপের কাছাকাছি যাওয়ার পূর্ব্বেই মানুষের দেহ গলিয়া বাষ্প হইয়া যাইবে। সেখানকার উত্তাপ কিংবা চাপের পরিমাণ আমাদের ধারণার অতীত। তবে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাহা অনুমান করেন, তাহাতে তাঁহাদের ধারণা এই যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর অপরিসীম উত্তপ্ত তরল পদার্থে অথবা বাষ্পে পরিপূর্ণ।

খনন কর ধরার পৃষ্ঠ,
দেখ্‌বে নিরন্তর—
ক্রমাগতই সাজান আছে
স্তরের পরে স্তর।

পূর্ব্বে যে আদি স্তরের কথা বলা হইয়াছে তাহা বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। সেই আদি স্তরের উপর ক্রমাগতই স্তর পড়িয়া কিরূপে যে পৃথিবীর বর্ত্তমান আবরণ গঠিত হইয়াছে, এখন তাহাই বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। এই সকল স্তর প্রধানতঃ দুই উপায়ে গঠিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে গলিত ধাতব পদার্থের স্রোত প্রবাহিত হওয়ার পর, ক্রমশঃ শীতল হইয়া যে স্তরের গঠন সম্ভবপর হইয়াছে তাহার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ জলস্রোতের স্তরগঠন-ক্ষমতা কতটুকু এখন তাহাই দেখা যাউক। অবশ্য পৃথিবী অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হইয়া জল উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জল কিংবা জলস্রোতের কাজ কখনও আরম্ভ হইতে পারে নাই। পৃথিবীতে জলস্রোত প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহার সাহায্যে ধরাপৃষ্ঠ নানা ভাবে ও নানা আকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহার ভাঙ্গা-গড়ার ক্ষমতা এক অদ্ভুত রকমের।

জলস্রোত যত বেশী বেগে আন্দোলিত হয় তাহার ভাঙ্গিবার শক্তিও তত বৃদ্ধি পায়। মিশ্রির টুক্‌রা জলে ফেলিয়া জল যত বেশী আন্দোলিত করা যায় মিশ্রির টুক্‌রা তত তাড়াতাড়ি গলিয়া যায়। ইহা ত তোমরা অনেক সময়েই দেখিয়া থাক। তাহা হইতে বিশেষ বেগবান জলস্রোতের ক্ষমতাও তোমরা সহজে অনুমান করিতে পার। এই জলস্রোতের সঙ্গে বহু কঠিন পদার্থ, যাহা জলে গলে না, তাহা ভাসিয়া যায়।

কোথাও কোন কারণে স্রোতের বেগ মন্দীভূত হইলে, এই সকল পদার্থ জলের তলে তলানি পড়িয়া অনবরত জমা হইতে থাকে। তাহাতেই নূতন স্তরের বা চরের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর স্তর যাহা উত্তপ্ত গলিত ধাতব পদার্থ ঠাণ্ডা

প্রাণিদেহ ও উদ্ভিদে পরিপূর্ণ পৃথিবীর স্তর সমূহের আনুমানিক চিত্র

উপরের অর্দ্ধাংশ
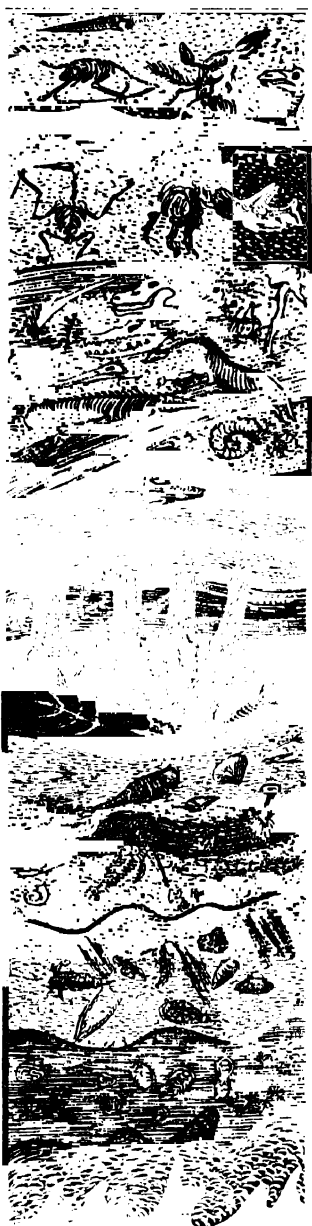
নীচের অর্দ্ধাংশ

পৃথিবীর উপর হইতে উহার অগ্নিময় অভ্যন্তর পর্য্যন্ত স্তরগুলিতে যেরূপভাবে উদ্ভিদের ও প্রাণীর দেহাবশেষ সাজান আছে তাহা দুইভাগে দেখান হইয়াছে।

হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে আগ্নেয় স্তর (igneous rocks) এবং জলস্রোতের সাহায্যে যাহা গঠিত হয় তাহাকে জলজ স্তর (aqueous crust) বলা হইয়া থাকে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর স্তর দেখিয়াই উহা গলিত ধাতব পদার্থ হইতে উৎপন্ন, কি জলস্রোতের সাহায্যে গঠিত তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন।

বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যে সকল শিলাস্তূপ বা পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই এই জলস্রোতের সাহায্যে গঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া পৃথিবীর স্তরে যে সকল উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ এই জলের আবর্ত্তন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সমুদ্রস্রোতে এবং জোয়ার-ভাটার ঘাত-প্রতিঘাতে তীরস্থ কঠিন পদার্থ হইতে বালির উৎপত্তি হয়। সেই বালিই আবার স্থান-বিশেষে, যেখানে স্রোতের বেগ কম, সেখানে জমা হইয়া এবং জমাট বাঁধিয়া, বেলে পাথরের (sand stone) স্তর উৎপন্ন করে। টুক্‌রা টুক্‌রা ক্ষুদ্র উপলখণ্ড অর্থাৎ গোলনুড়ি, কঙ্কর (shingle) ইত্যাদিও বালির মত, জলের ঘাতপ্রতিঘাত হইতেই উৎপন্ন হয়। চাখড়ির পাহাড়ের (chalk cliff) ন্যায় নানা রকমের পাহাড়, যাহা প্রাচীনতম যুগের লক্ষ লক্ষ প্রাণিদেহ হইতে বহু বৎসরব্যাপী চাপে চাপে একত্রীভূত হইয়া গঠিত হইয়াছে, সেই জাতীয় পাহাড় গঠনেও জল যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। পৃথিবীর অনেক জিনিসই প্রথমতঃ জলে গলিয়া তরল হইয়া যায়। কালক্রমে জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেলে সে সকল জিনিস আর তরল থাকে না; সুতরাং জমাট বাঁধিয়া নানা আকার প্রাপ্ত হয়।

পৃথিবীর সেই স্তরগঠনের কাজ এখনও চলিতেছে। নৌকা কিংবা ষ্টিমারে যদি তোমরা কখনও কোন নদীতে চলাফেরা কর, তাহা হইলে নদীস্রোতে যে সকল স্থানে তীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিও। তাহা হইতে স্তরের উপর স্তর কিরূপভাবে পুস্তকের পাতার মত একটির উপর আর একটি সাজান থাকে, তাহা বুঝিতে পারিবে। পৃথিবীর প্রাচীনতম যুগের এরূপ স্তর জমিয়া স্থানে স্থানে একেবারে পাথর হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন হইতে কত সময় লাগিয়াছে তাহা অনুমান করাও সহজ নহে।

কোন্ অতীতে প্রাণের সাড়া
জড়ের মাঝে এল,
কে বলিবে গড়্‌তে ধরা
কত বছর গেল ?

গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণ, বর্ত্তমানে পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে যে অনুমান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা বলেন যে, পৃথিবী দুইশত কোটি বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে সূর্য্য হইতে পৃথক্ হইয়াছে। অন্ততঃ ত্রিশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে যে উহাতে বহু জীবন্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সমাজবদ্ধ মানবও অন্ততঃ ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহার পর সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহের উৎপত্তি হইতে, পৃথিবীর বর্ত্তমান বয়সের কথা বলিতে হইলে, তাহা সংখ্যায় প্রকাশ করাই কঠিন। অবশ্য পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ তাহারও একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহের বয়স নিরূপণের চেষ্টাকেই অনেকের নিকট নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক এবিষয়ে এতকাল বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন রকমের মত শুনা গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই সকল মতের আলোচনা করিয়া এবং যে সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ইহা নির্ণীত হইয়াছে, তাহাতে ইহা নিতান্ত ভুল বলিয়া মনে হয় না।

উত্তাপের দরুণ পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যদিও মানুষের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তথাপি পৃথিবী হইতে পৃথিবীর তত্ত্ব সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কেননা আমাদের পায়ের নীচেই পৃথিবীর আবরণ। তোমরা ইচ্ছা করিলেই সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের বর্ত্তমান অবস্থা পরীক্ষা করিয়া ও পাহাড়-পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়া, পৃথিবীর অতীত সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পার। এরূপ নানাভাবে নানা দিক দিয়া, ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া পৃথিবীর অতীত সম্বন্ধে যে সব সত্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই

বড় বিস্ময়জনক। সমুদয় পৃথিবীর যতটুকু পরীক্ষা করিয়া দেখা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর, তাহার হাজার ভাগের একভাগ অংশও আজ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা সম্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যেই অতীতের পৃথিবী, অতীতের গাছপালা, জীবজন্তু ও মানব সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব জানা গিয়াছে। এই অনুসন্ধানের ফলে ভূগর্ভে শত শত বিভিন্ন শ্রেণীর শিলীভূত উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পৃথিবীর আদি স্তরের ভিতর জীবন্ত পদার্থের কোন চিহ্ন নাই। সেই সময়ে জীবন্ত পদার্থ থাকিলেও, খুবই কোমল ছিল। তাহাদের কোন কিছু চিহ্ন এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তারপর যখন কঙ্কাল বিশিষ্ট অথবা খোলসধারী উন্নততর প্রাণীর আবির্ভাব হইল, তখন হইতে তাহাদের শিলীভূত দেহাবশেষ পৃথিবীর স্তরের ভিতর রক্ষিত হইতে লাগিল। বর্ত্তমানে তাহাই পরীক্ষা করিয়া, তাহাদের এবং তৎকালীন পৃথিবীর সম্বন্ধে বহু কথা জানা গিয়াছে। মৃত উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর শিলীভূত দেহ যুগে যুগে বিভিন্ন স্তরে সঞ্চিত হইয়াছে। এই সকল স্তর জমিয়া পাথর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহারাও কঠিন হইয়া গিয়াছে। ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার বর্ত্তমানে ইহাই প্রধান উপকরণ।

পৃথিবীর জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত স্তরের উপর স্তর পড়িয়া পৃথিবীতে যে স্তরসমষ্টির সৃষ্টি হইয়াছে, ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রথমতঃ তাহাকে পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁহারা সেই প্রত্যেক ভাগকে আবার নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। স্তর-বিভাগ সময়ে বিভিন্ন স্তরের পাথর এবং তাহার ভিতরকার গাছপালা ও জীবজন্তুর আকৃতি-প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়াই, তাঁহারা এই শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন। উহাদের প্রত্যেকের বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়; হয়ত সকল কথা তোমরা বুঝিতেও পারিবে না। কিন্তু সাধারণভাবে উহাদের কথা বুঝিবার পক্ষে তোমাদের কোনই অসুবিধার কারণ নাই। বিশেষত; অতীতের যত রকম কথা—সকলেরই ভিত্তি বা মূলে উহারাই; সুতরাং উহাদের কথা তোমাদের সকলেরই জানা দরকার।

পৃথিবীর আদি স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানে গঠিত স্তর পর্যান্ত, পৃথিবীর সকল স্তরের যে প্রধান পাঁচটি ভাগ করা হইয়াছে তাহাদের নাম যথাক্রমে ;—(১) নবজৈবিক (Cainozoic), (২) মধ্যজৈবিক (Mesozoic), (৩) প্রাচীনজৈবিক (Paleozoic), (৪) প্রাচীনতর-জৈবিক (Proterozoic), (৫) প্রাচীনতমজৈবিক (Archeozoic)। এই পাঁচটি প্রধান বিভাগের কথা সাধারণভাবে এখানে বলা হইল।

কানাডা রাজ্যে পৃথিবীর আদিস্তর এখনও বহু স্থানে ফাটা, বাঁকা এবং অংশতঃ গলা অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই স্তরে সাক্ষাৎভাবে জীবন্ত কোন পদার্থের চিহ্ন নাই। এজন্য ইহাকে জীবশূন্য (Azoic) স্তর বলা হইয়া থাকে। কিন্তু উহাতে এমন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গিয়াছে, জীবন্ত প্রাণীর সাহায্য ছাড়া যাহাদের উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে কোন কোন ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত, উহাতে খোলস ও কঙ্কালহীন নিতান্ত কোমল কোন কোন জীব ছিল বলিয়া অনুমান করেন। সেজন্য তাঁহারা এই স্তরেরই নাম দিয়াছেন (১) প্রাচীনতমজৈবিক (Archeozoic) স্তর। এই স্তর গঠিত হওয়ার সময় পৃথিবীতে প্রাণী ছিল কিনা, তাহা এখনও কিন্তু নিশ্চিতরূপে ঠিক হয় নাই। কারণ তাঁহারা সকলেই অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই এসকল কথা বলিয়াছেন।

নবজৈবিক (Cainozoic)
মধ্যজৈবিক (Mesozoic)
প্রাচীন জৈবিক (Paleozoic)
প্রাচীনতরজৈবিক (Proterozoic)
প্রাচীনতমজৈবিক (Archeozoic)

পৃথিবীর স্তর সমষ্টির প্রধান পাঁচ ভাগ স্তরের নক্সা চিত্র

এই স্তরের উপরে যে স্তর গঠিত হইয়াছিল, যদিও তাহা খুবই প্রাচীন এবং ভাঙ্গাচূরা, তথাপি উহা গঠিত হওয়ার সময় পৃথিবীতে যে জীবন্ত পদার্থ ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ্ ও কীট জাতীয় প্রাণীর চলাফেরার চিহ্ন এখনও এই স্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেই (২) প্রাচীনতরজৈবিক (Proterozoic) স্তর বলে। কেননা প্রাচীন স্তরের মধ্যে, এই স্তরেই সর্ব্বপ্রথম নিশ্চিতরূপে প্রাণীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উহাই পৃথিবীর দীর্ঘকালব্যাপী অতীতের নানারূপ অজ্ঞাত ঘটনার আধার। তাহার উপরে (৩) প্রাচীনজৈবিক (Paleozoic) স্তর গঠিত হইয়াছিল।

সেই প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় মধ্যে, পৃথিবীতে তলানি পাথরের (Sedimentary rocks) বহু স্তর গঠিত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রাচীনজৈবিক স্তরের উপরকার তলানি পাথরের স্তরগুলিকে, দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে পৃথিবীর ভিতরদিকে যে সকল স্তর আছে সেগুলিকে তাঁহারা (৪) মধ্যজৈবিক (Mesozoic) স্তর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শিলীভূত প্রাণিদেহপরিপূর্ণ এই স্তর-গঠনে যে কত কোটি বৎসর অতীত হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। ইহা একটি বিশাল যুগ। উহাতে সারি সারি অত্যাশ্চর্য্য অতিকায় সরীসৃপের অস্থিপঞ্জর দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের কথা পরে বলা হইবে।

এই মধ্যজৈবিক স্তরের উপরে (৫) নবজৈবিক (Cainozoic) স্তর। সকল জৈবিক স্তরের মধ্যে ইহাই অসম্পূর্ণ সুবৃহৎ শেষ স্তর। ইহার গঠন-কার্য্য এখনও চলিতেছে। বর্ত্তমানের নদীসমূহ ধূলা বালি কাদা বহন করিয়া নিয়া, যে সকল উদ্ভিদ্ এবং প্রাণিদেহকে, স্তরের উপর স্তর দ্বারা আবৃত করিতেছে, সুদূর ভবিষ্যতে তাহারাই প্রস্তরীভূত হইয়া পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ বিদ্যমান রহিবে; আর পৃথিবীতে এই স্তরের উপর স্তর গঠনের কার্য্য চলিতে থাকিবে।

শিলীভূত প্রাণী গাছপালা
আছে গাঁথা পাথরের স্তরে ;
অতীতের অভিনব কথা—
তাই হ'তে জ্ঞানী জড় করে।

পাহাড়-পর্ব্বতের স্তরের ভিতরকার নানা প্রকার চিহ্ন, শিলীভূত উদ্ভিদ্ এবং প্রাণিদেহই পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান উপাদান। অবশ্য মানুষের লিখিত ইতিহাসে, তোমরা যেমন সকল কথা একটির পর একটি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দেখিতে পাও ইহাতে সেরূপভাবে কোন কথাই সহজে বুঝিবার উপায় নাই। যুগে যুগে পৃথিবীতে যখন যাহা ঘটিয়াছে, এই পাথরের স্তরের উপর তাহারই চিহ্ন রহিয়াছে। তাহাতে না আছে কোন শৃঙ্খলা, না আছে কোন নিয়ম। অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, জলস্রোত প্রভৃতির নানারূপ অত্যাচারে, এই সকল স্তর অনেক স্থলেই আঁকা-বাঁকা হইয়া এবং ভাঙ্গিয়া কালক্রমে স্বাভাবিক অবস্থার বিকৃতি হইয়াছে। তবুও বুদ্ধিমান্ জ্ঞানী লোকেরা উহা হইতেই চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের বলে অতীতের বহু খবর সংগ্রহ করিয়াছেন। তোমরাও চেষ্টা করিলে এই ক্ষমতা লাভ করিয়া ভূগর্ভ হইতে বহু অজ্ঞাত খবর সংগ্রহ করিতে পারিবে।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে লিওনারডো ডা ভিন্সি (Leonardo da Vinci) নামক এক ব্যক্তি প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ্ এবং প্রাণিদেহের মধ্যে যে অতীতের পৃথিবীর বহু খবর লুকান আছে, সর্ব্বপ্রথম তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ অধিক দেড়শত বৎসর হইল ভূতত্ত্বের প্রতি মানবের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। এখনও এবিষয়ের বহু তত্ত্ব মানবের অজ্ঞাত।

আলোচনার সুবিধার জন্য ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর স্তরসমূহের পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি প্রধান ভাগের মধ্যে শেষের তিনটির অর্থাৎ প্রাচীনজৈবিক, মধ্যজৈবিক ও নবজৈবিকের আরও কতকগুলি বিভাগ করিয়াছেন।

টীকা ঃ—নক্সাতে বিভিন্ন যুগের স্তরের সীমানা সোজা হইলেও বাস্তবিক কিন্তু তাহা খুবই বাঁকা এবং ভাঙ্গাচুরা। তাহার কারণ পূর্ব্বেই বুঝান হইয়াছে।

নবজৈবিক স্তরের বৃহত্তর নক্সা	ইহার বিভিন্ন বিভাগে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়
প্লিস্টোসিন (Pleistocene)	মানুষ, মেমথ, মাষ্টডনের দেহাবশেষ
প্লাইওসিন (Pliocene)	
মাইওসিন (Miocene)	তিন অঙ্গুলী বিশিষ্ট ঘোড়ার চিহ্ন
ওলিগোসিন (Oligocene)	চতুর্দ্দন্তীর দেহাবশেষ
ইওসিন (Eocene)	আরসিনোথেরিয়াম (Arsinoitherium) ডিনোসেরাস (Dinoceras)
৩	
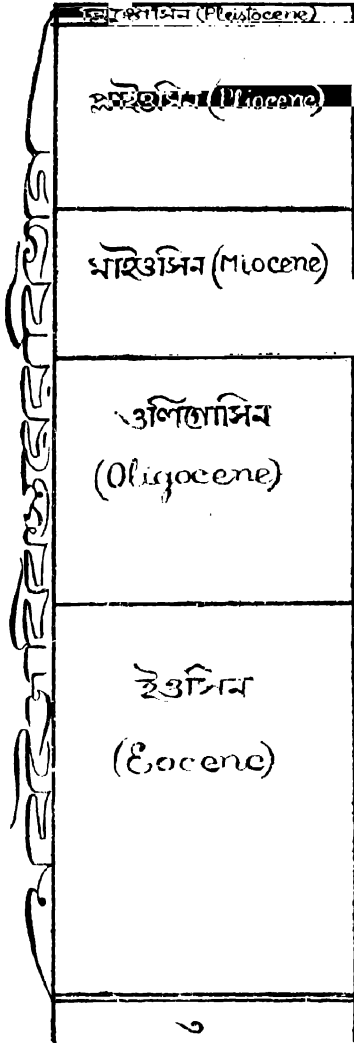
টীকা :—নক্সাতে বিভিন্ন যুগের স্তরের সীমানা সোজা হইলেও বাস্তবিক কিন্তু তাহা খুবই বাঁকা এবং ভাঙ্গাচুরা। তাহার কারণ পূর্ব্বেই বুঝান হইয়াছে।

নক্সা চিত্র দুইটি হইতেই তোমরা তাহাদের নাম জানিতে পারিবে এবং প্রত্যেকের তুলনামূলক বেধেরও (thickness) একটা ধারণা করিতে পারিবে। উহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই সমসাময়িক পৃথিবীর জল ও স্থলভাগের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং স্তরের প্রকৃতি, ছবিসহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল। তাহা হইতেই তোমরা তৎকালীন পৃথিবীর মোটামুটি অবস্থা বুঝিতে পারিবে।

কেম্‌ব্রিয়ান যুগে পৃথিবী
(Cambrian Age)

পৃথিবীর প্রাচীনজৈবিক (Paleozoic) স্তরের সর্ব্বনিম্ন স্তরসমষ্টিকে কেম্‌ব্রিয়ান যুগের স্তর বলা হইয়া থাকে এবং এই সকল স্তর গঠনের সময়কে কেম্‌ব্রিয়ান যুগ বলা হয়। এই স্তরগুলি নীচের দিকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল পর্য্যন্ত পুরু হইবে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ওয়েলসের প্রাচীন নাম কেম্‌ব্রিয়া ছিল এবং এই স্থানেই ঐ যুগের স্তরগুলির খবর প্রথম জানা গিয়াছিল বলিয়া উহাদের এই নাম রাখা হইয়াছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অগ্নিময় উত্তপ্ত পদার্থের অপরিসীম শক্তির বেগে প্রস্তরময় এই স্তরগুলি উর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই ভাঙ্গা স্তরের উপরের অংশ নানাস্থানে অনাবৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে পৃথিবীর স্থানে স্থানে এমন কি দুই হাজার হাত পর্য্যন্ত উঁচু পাহাড়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিরূপে পৃথিবীর নীচের স্তর উপরে আসা সম্ভবপর হইল তাহা পূর্ব্বেই বুঝান হইয়াছে এই স্তরের পাথরের একটি বিশেষত্ব এই যে, সহজেই উহার কঠিন সমতল এবং পাতলা পরতগুলি, তালপাতার বইয়ের পাতার মত একটির পর একটিকে পৃথক্ করা যায়। উহাকে শ্লেট পাথর বলে। টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া উহাদ্বারা ঘরের ছাদ নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানা রকম কাজ করা হইয়া থাকে।

উহা হইতে শুধু শ্লেট পাথরই যে পাওয়া যায় তাহা নহে ; নানা রকম অদ্ভুত জিনিসের সঙ্গে তৎকালীন বহু খবর জানিবার সুযোগও পাওয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে যে, এই কঠিন সমতল শ্লেট
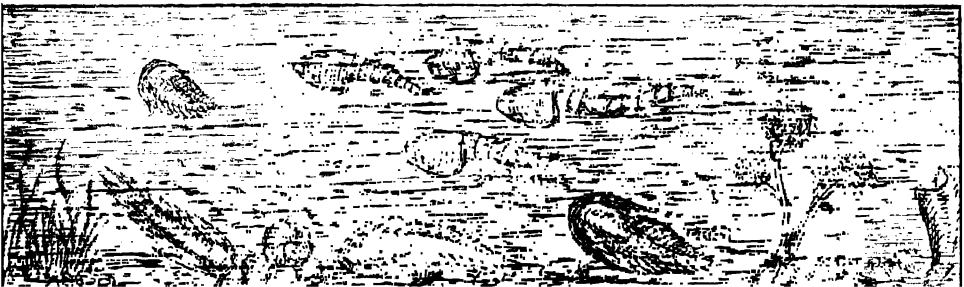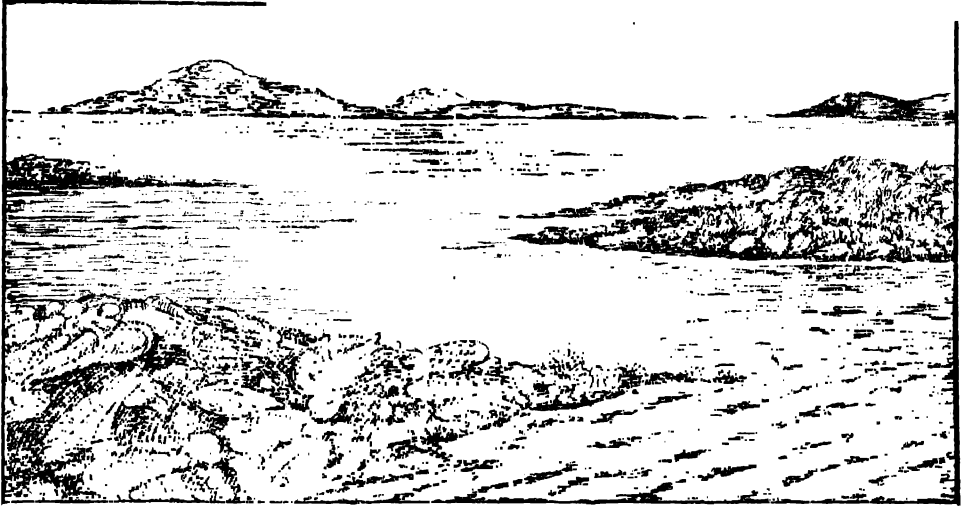
কেমব্রিয়ান যুগের পৃথিবীর উপরিভাগ এবং সমুদ্রতলে জলের ভিতরের আনুমানিক দৃশ্য

পাথরের পরতগুলি একসময় কর্দ্দম বা কাদামাটির অবস্থায় ছিল এবং তাহা অগভীর সমুদ্রতল কিংবা তাহার সন্নিহিত তীরভূমিতে সঞ্চিত

হইয়াছিল। উহা হইতে অন্যূন পঞ্চাশ কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে যে প্রাণী ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে সময়ে কোন মেরুদণ্ডী প্রাণীই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল না। জলে মাছ, আকাশে পাখী, স্থলভাগে সরীসৃপ কিংবা স্তন্যপায়ী প্রাণীর তখন আবির্ভাব হয় নাই। উদ্ভিদের মধ্যেও তরু-লতা-গুল্ম ত দূরের কথা—ঢেকিশাক্ জাতীয় কোন গাছ পর্য্যন্তও পৃথিবীতে জন্মে নাই। প্রাণীর মধ্যে সমুদ্রজলে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর নিম্ন-স্তরের খোলসধারী প্রাণীই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমানের ছোট চিংড়ি, গলদা চিংড়ির পূর্ব্বপুরুষ ফাইলোপড (Phyllopods) এবং ত্রিবলীর (Trilobite) সংখ্যাই বেশী। ত্রিবলীর বর্ত্তমান বংশধরের মধ্যে চীনদেশের রাজা কাঁকড়ার (King crab) নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাদের উভয়ের মধ্যে আকারে খুবই পার্থক্য দেখা যায়। উদ্ভিদের মধ্যে সম্ভবতঃ মস্ (Moss), লাইকেন (Lichen) ও অন্যান্য নিতান্ত নিম্নস্তরের উদ্ভিদ্ ছিল।

পশুপক্ষীর কোন শব্দ ছিল না সত্য, কিন্তু সমুদ্র ও প্রবল জল-ঝড়ের গর্জ্জনের বিরাম ছিল না। সমুদ্রতরঙ্গের আঘাতে তীরবর্ত্তী পাহাড়-পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত এবং ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল।

সিলুরিয়ান যুগে পৃথিবী
(Silurian Age)

সুদীর্ঘ সিলুরিয়ান যুগের স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আজ পর্য্যন্ত যাহা বর্ত্তমান আছে তাহাও প্রায় পাঁচ মাইল গভীর। এই যুগের স্তর ক্ষয় হইয়া পরবর্ত্তী সময়ের পাহাড়ের উপাদান উৎপন্ন হইয়াছিল। উহা গঠিত হইতেই অন্ততঃ ষাট লক্ষ বৎসরের কম সময় লাগে নাই। আর সিলুরিয়ান যুগের সমুদয় স্তর গঠিত হইতে অন্ততঃ ছয় কোটি বৎসর অতিবাহিত

হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন। এসব বিষয়ে অভ্রান্তরূপে সময়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা কখনই সম্ভবপর নহে। গণনা যতটুকু নির্ভুল হওয়া সম্ভবপর তাহার জন্য পণ্ডিতেরা সব সময়েই চেষ্টা করিয়া থাকেন।

সিলুরিয়ান যুগের পৃথিবীর উপরিভাগ এবং সমুদ্রতলে জলের ভিতরের আনুমানিক দৃশ্য

সিলুরিয়ান যুগের স্তরগুলিকে আবার উপর নীচ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। উহার নীচের দিকের স্তরগুলিকে সাধারণতঃ ওরডোভিসিয়ান (Ordovician) স্তরসমষ্টি বলা হইয়া থাকে। তাহাতে

প্রাচীন এবং নিম্নতর শ্রেণীর সাধারণ প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। এই যুগের প্রায় সমুদয় পাহাড়ই চুণা পাথরে গঠিত। অন্য অংশের শিলনুড়ি, পচাগলা কাদা অথবা বালি চাপে পড়িয়া ক্রমশঃ কঠিন হইয়া বেলেপাথরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। বেলেপাথর নদীর মোহনা ও সমুদ্রের বালিপূর্ণ তীরস্থ ভূভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। আর চূণা পাথরের স্তরগুলি এক সময়ে সমুদ্রের গভীর তলদেশেই বর্ত্তমান ছিল এবং সেখানেই উৎপন্ন হইয়াছে।

এই স্তরেই সর্ব্বপ্রথম এক অদ্ভুত আকারের ছোট ছোট মাছের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অতীতের পৃথিবীর এই যুগেই মেরুদণ্ডী প্রাণীর আরম্ভ। ইহার পর হইতেই মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্রমোন্নতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ডহীন প্রাণী ক্রমশঃ ক্ষুদ্রকায় ও অল্পায়ু হইতে লাগিল। এই সময় বহু নিম্নশ্রেণীর প্রাণী বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু তাহারা প্রায় সকলেই সমুদ্রজলবাসী। তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি অদ্ভুত প্রাণী ছিল যাহারা উদ্ভিদের মত বোঁটা ও মূলবিশিষ্ট এবং সমুদ্রতলের পাহাড়ের গায়ে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকিত। প্রবাল-উৎপাদক প্রাণী তখনও সমুদ্রতলে বাস করিত। পূর্ব্বোক্ত কেম্‌ব্রিয়ান যুগের স্তরে, ত্রিবলী নামক যে প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়, এযুগেও তাহা প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়া থাকে; কিন্তু খোলসধারী ফাইলোপডের (Phyllopods) সংখ্যা তখন খুবই বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি বড় গল্‌দা চিংড়ির মত আকারে বড় ছিল। সে সময় প্রায় সাড়ে তিন হাত লম্বা টেরিগোটাস্‌ (Pterygotus) নামক প্রাণী সমুদ্রমধ্যে বিচরণ করিত। গল্‌দা চিংড়ির মত আকারের এই সুবৃহৎ প্রাচীন প্রাণীর শিলীভূত কতিপয় দেহ এই স্তরে পাওয়া গিয়াছে।

তৎকালীন সমুদ্রের অনুর্ব্বর বেলাভূমিতে কোন বৃক্ষলতা কিংবা ফল-ফুলের চিহ্ন ছিল না। উদ্ভিদের মধ্যে মস্‌ (Moss) এবং ঢেকিশাক শ্রেণীর গাছ ছিল বলিয়া মনে হয়।

ডিভোনিয়ান যুগে পৃথিবী

(Devonian Age)

ডিভোনিয়ান যুগের নাম ডিভোনসায়ার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ডিভোনসায়ারেই এই যুগের প্রাচীন লাল বেলেপাথর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়া থাকে। তাহাতেই এই যুগের স্তরের গঠন সময়ের নাম ডিভোনিয়ান যুগ। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে, ইউরোপের উত্তরাংশে, উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তৃত ভূভাগে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও এই যুগের স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই যুগে মৎস্যের খুবই বৃদ্ধি এবং উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া উহাকে মৎস্য অবতারের যুগও বলা যাইতে পারে। সিলুরিয়ান যুগে যাহারা দেখিতে ক্ষুদ্র এবং অদ্ভুত আকারের ছিল, লক্ষ লক্ষ বৎসরের পরিবর্ত্তনের ফলে, তাহারাই এযুগে যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। ক্ষুদ্র মাছের প্রধান শত্রু টেরিগোটাসের মত ভীষণ প্রকৃতি নানারকম প্রাণীর আকার যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছিল, তেমনি তাহাদের সংখ্যাও বড় বড় হ্রদ এবং সাগরে ক্রমাগতই বাড়িতেছিল। তখন সেই ক্ষুদ্র মাছের দেহ হইতে খোলসের আবরণ লোপ পাইয়া তাহাদের দেহের ভিতরে মেরুদণ্ডের উৎপত্তি হইল এবং তাহাদের এক একটির আকৃতি-প্রকৃতিও ভীষণ রকমের হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ হাতের উপরও লম্বা হইয়াছিল। আত্মরক্ষার চেষ্টা হইতেই তাহাদের এই পরিবর্ত্তন।

লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী সুদীর্ঘ ডিভোনিয়ান যুগে মাছ যে শুধু আকারেই বড় হইয়াছিল তাহা নহে, জলে, চলাফেরার সুবিধার জন্য ডানা বা পাখ্না, যুদ্ধের সুবিধার জন্য মুখে বেশ সবল এবং সুচল দন্তপাটির উৎপত্তি হইল। ভীষণপ্রকৃতি হাঙ্গর এই যুগেই প্রথম দেখা দিয়াছিল। সে সময় টাইটান মাছ (Titan fish) নামক হাঙ্গরের চাইতেও উচ্চ শ্রেণীর আরও এক প্রকার

মাছ ছিল। এই যুগে ডিপ্‌টেরা (Diptera) নামক আর একটি প্রাণীর

ডিভোনিয়ান যুগের পৃথিবীর উপরিভাগ এবং সমুদ্রতলে জলের ভিতরের আনুমানিক দৃশ্য

উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহার জল হইতে উপরে উঠিয়া ডাঙ্গায় চলাফেরা

করার দিকে ঝোঁক ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহা হইতেই প্রাণী যে উভচর হওয়ার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকাতে যে লাং মাছ (Lungh fish) পাওয়া যায় উহা তাহাদেরই বংশধর। ককোস্‌টিয়াস (Coccosteus)

অষ্ট্রেলিয়ার লাং মাছ (Lungh fish)

নামক এই যুগেরই আর একটি প্রাণী বর্ত্তমানের উভচর কুম্ভীর ও নিউটের (Newt) সাক্ষাৎ পিতামহ অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষ।

অতীত যুগে স্থলভাগে যে সকল গাছের উৎপত্তি হইয়াছিল মস্‌কেই তাহাদের মধ্যে একরূপ আদি বলা যাইতে পারে। এই ডিভোনিয়ান যুগে তাহাদেরই এক একটির আকার বড় বড় গাছের মত ছিল। এই মস্‌বৃক্ষেরই নাম লেপিডোডেনড্রন (Lepidodendron)। ঢেকিশাক ও নলজাতীয় গাছের তখন মস্ত বড় জঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন ঢেকিশাকের গাছই তালগাছের মত বড় হইত। এই যুগের স্তরে পাইনগাছের চিহ্ন পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে কোন ফুল ছিল না। গাছপালার অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, তখনকার আবহাওয়া আর্দ্র ছিল। মেঘে আকাশ প্রায় সব সময় আবৃত থাকিত এবং ঝড়বৃষ্টি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত। সূর্য্যালোক খুব কম সময়েই দেখা যাইত।

অঙ্গারক বা পাথর কয়লার যুগে পৃথিবী

(Carboniferous Age)

পাথর কয়লার যুগের স্তর পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, কোথাও বা স্থানে স্থানে অল্প পরিমাণে আর কোথাও বা বিস্তৃত ভূভাগ

অঙ্গারক যুগের পৃথিবীর উপরিভাগ এবং জলের ভিতরকার আনুমানিক দৃশ্য

ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছে। উহাতে সাধারণতঃ দুই রকম পাথরের স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাল-উৎপাদক প্রাণীর দরুণ সমুদ্রগর্ভে চূণা পাথর, আর

অগভীর হ্রদ, সাগরাংশে (Lagoon) বেলে পাথর ইত্যাদির উৎপত্তি হইয়াছিল। এই উভয় রকম স্তরের ভিতরেই পাথর কয়লা ও লৌহের খনি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি অতীব প্রয়োজনীয় জিনিসের আধার বলিয়া এই যুগের স্তরগুলিকে খুবই মূল্যবান বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে।

এযুগে নানা রকম প্রাণীই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল। সমুদ্রগর্ভের পাহাড়ে, প্রবাল-উৎপাদক প্রাণী ও অন্যান্য সাধারণ শ্রেণীর প্রাণীর বহু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যে পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, তাহাতে শুধু মাছই ছিল সাত শত রকমের। মাছের মধ্যে হাঙ্গরের সংখ্যাই বেশী। ভূচর প্রাণীর মধ্যে ষট্‌পদীবর্গের অন্তর্গত আরসোলা, গোবরে পোকা, পঙ্গপাল, করলা ফড়িং প্রভৃতি প্রাণীর বহু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বৃশ্চিকের সংখ্যাও বহু ছিল, কিন্তু ত্রিবলীর (Trilobite) সংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছিল। উভচর প্রাণীর আদি লেবিরিন্থোডোণ্ট (Labrinthodont) এই যুগেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। সে-সময়কার সরীসৃপের কঙ্কাল না পাওয়া গেলেও, কানসাস (Cansas) নামক স্থানের পাথর কয়লার স্তরে সরীসৃপের পদচিহ্নের মত চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

এই যুগে উদ্ভিদ্‌ যে খুব প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছিল তাহা বোধ হয় না বলিলেও তোমরা বুঝিতে পার। কেননা, সুবৃহৎ বনে তৎকালে পৃথিবী আবৃত না থাকিলে, এত প্রভূত পাথর কয়লার স্তর উৎপত্তি হওয়া কখনই সম্ভবপর হইত না। উদ্ভিদ্‌ যে শুধু সংখ্যাতেই তখন বেশী ছিল তাহা নহে, তাহারা সকলেই বেশ সতেজ এবং পুষ্ট ছিল। বায়ুতে উদ্ভিদের খাদ্য কারবন-ডায়ক্সাইড (Carbon-dioxide) প্রচুর পরিমাণেই বিদ্যমান ছিল। বায়ু হয়ত এখনকার চেয়ে কিঞ্চিৎ উষ্ণও ছিল। অবশ্য শিলীভূত উদ্ভিদ্‌ পরীক্ষা করিয়া এসব বিষয়ে সত্য নির্দ্ধারণ করা কখনই সম্ভবপর নয়। কিন্তু তৎকালীন আবহাওয়া পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই যে শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল

এবং একরূপ ছিল, তাহা তৎকালীন উদ্ভিদের সব স্থানে সমান বৃদ্ধি দেখিয়া অনুমান করা যায়।

তখনকার বনজঙ্গল বর্ত্তমানের অপেক্ষা খুবই ভিন্ন রকমের ছিল। সেই বনে বিশাল মস্, ঢেকিশাক, অশ্বপুচ্ছ (Horsetails) ও সাইকাড্ (Cycud) গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া জঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছিল। সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই বনজঙ্গল বৃদ্ধি এবং ধ্বংস হইয়া পাথর কয়লার আকার ধারণ করিয়াছে। এই সকল গাছ প্রায় প্রত্যেকেই কম-বেশী চল্লিশ হাত পর্য্যন্ত উঁচু হইত। তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে কাহারও কাহারও আকার মাত্র কয়েক ইঞ্চিতে পরিণত হইয়াছে।

এই পাথর কয়লার স্তরের উপরে পারমিয়ান যুগের (Permian Age) স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তরগুলি উপরদিকে অংশতঃ মধ্যজৈবিক (Mesozoic) এবং নীচের দিকে প্রাচীনজৈবিক (Paleozoic) স্তরের অন্তর্গত। পৃথিবীর স্তরবিভাগে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা নির্দ্দেশ করা প্রায় একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। কেননা একটি যুগের ঠিক নীচের কিংবা উপরের স্তর যে উহার স্তর হইতে একেবারেই ভিন্ন রকমের হইবে, তাহা কখনই হইতে পারে না। উপর ও নীচের স্তরের সঙ্গে মধ্যের স্তরের কোন না কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিবেই থাকিবে। উহা তোমরাও একটু লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে। এই যুগের প্রাণিদেহের কঙ্কাল সাধারণতঃ চূণা পাথরের স্তরের ভিতরে দেখিতে পাওয়া যায়। সরীসৃপের কঙ্কালও এযুগের স্তরে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। উভচর প্রাণীর সংখ্যা সে-সময় বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু গাছপালার সংখ্যা পূর্ব্বোক্ত যুগের চাইতে অপেক্ষাকৃত কমিয়া গিয়াছিল।

ট্রায়াসিক যুগে পৃথিবী
(Triassic Age)

এ পর্য্যন্ত প্রাচীনজৈবিক যুগের বিভিন্ন স্তরের কথাই বলা হইল, ট্রায়াসিক যুগ (Triassic Age) হইতেই মধ্যজৈবিক যুগের আরম্ভ। এ যুগে পাহাড়,

ট্রায়াসিক যুগের পৃথিবীর উপরিভাগ ও জলের ভিতরকার আনুমানিক দৃশ্য

পর্ব্বত, প্রাণী, গাছপালার সাধারণ আকার এবং প্রকৃতির যে খুবই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। পৃথিবীর স্তর তখন দৃঢ়তর এবং স্থায়ী

হইয়াছিল। আদি প্রাচীনতম যুগে বহু আগ্নেয়গিরি হইতে ঘন ঘন অগ্ন্যুদ্গম ও সঙ্গে সঙ্গে গলিত ধাতব পদার্থ এবং লাভার স্রোত ভূভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত। কিন্তু এই মধ্যযুগে আগ্নেয়গিরির সংখ্যাই যে শুধু কমিয়া গিয়াছিল তাহা নহে, যাহারা ছিল তাহাদের আকারও খুব ছোট হইয়াছিল এবং তাহাদের মুখ হইতে কদাচিৎ প্রবল বেগে অগ্ন্যুদ্গম হইত।

প্রাণী ও উদ্ভিদ্-জীবনে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ফলে প্রাচীনতম প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া তাহাদের স্থানে নূতন এবং উন্নততর প্রাণী ও উদ্ভিদের আবির্ভাব হইল। ত্রিবলী একেবারে লোপ পাইয়াই গিয়াছিল। কুম্ভীর প্রভৃতি সরীসৃপ ও লেবিরিন্থোডোণ্টের (Labyrinthodonts) কঙ্কাল এবং পদচিহ্ন এই স্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। সরীসৃপের প্রকৃতি আবার নানা রকমের ছিল। কতকগুলি টিক্‌টিকির মত চারি পায়ে, আর কতকগুলি ডিনোসরাসের মত পিছনের পায়ে ভর দিয়া চলাফেরা করিত। কতকগুলি আবার মাছের মত সমুদ্রজলে সাঁতার কাটিত। স্তন্যপায়ী প্রাণীর চিহ্ন এই যুগেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ঢেকিশাক, অশ্বপুচ্ছ ও মস্ প্রভৃতি পাথর কয়লার যুগের বিশাল বিশাল গাছ সে সময় ক্রমশঃ ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছিল। আর তাহাদের স্থান পাইন ও সাইকাড্ প্রভৃতি গাছ ক্রমশঃ অধিকার করিল। পৃথিবীর কোন কোন স্থানে, যেমন — নিউজিলাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়াতে, এই যুগের গাছ হইতেই অবশ্য পাথর কয়লার উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই সব স্থানে তখনও ঢেকিশাক, সাইকাড্ গাছ ও তাহারই মত অন্যান্য 'কোন' (Cone) উৎপাদক গাছ বর্ত্তমান ছিল।

বাস্তবিক কিন্তু উহা সাইকাড্ (Cycud) গাছেরই যুগ। এসকল গাছ দেখিতে ঢেকিশাকের গাছের মত হইলেও পাইনগাছের সঙ্গেই উহাদের নিকট সম্পর্ক। পাথর কয়লার যুগের মত উদ্ভিদ্ তত সতেজ ও পুষ্ট ছিল না।

ট্রায়াসিক যুগের স্তরগুলিকে, প্রাচীন ও মধ্যজৈবিক যুগের মধ্যে পাথর-নির্ম্মিত সীমা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এ যুগের স্তর পৃথিবীর প্রায়

সর্ব্বত্রই আছে। অঙ্গারক বা পাথর কয়লার যুগের মত উহাতেও দুই রকম পাথরের স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। হ্রদ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন লাল বেলে পাথরের স্তর স্থানে স্থানে লবণ ও চূণা পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান আছে। লোনা জল ক্রমশঃ বাষ্প হইয়া শুকাইয়া যে কাদার উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা হইতেই এই স্তরের উৎপত্তি। উহার স্থানে স্থানে প্রাণীর পদচিহ্ন বৃষ্টির জল ও ঢেউয়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রৌদ্রতেজে ফাটিয়া যাওয়ার চিহ্নও কোন কোন স্থানে বর্ত্তমান আছে। গভীর সমুদ্র-জলে গঠিত স্তরগুলি, সহস্র সহস্র হাত পুরু চূণা পাথর ইত্যাদিতে গঠিত হইয়াছে। উহা প্রভৃত সামুদ্রিক প্রাণীর দেহে পরিপূর্ণ।

জুরাসিক যুগে পৃথিবী

(Jurassic Age)

ট্রায়াসিক এবং জুরাসিক যুগের প্রাকৃতিক পার্থক্য খুব কম। এই যুগের পাহাড় পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র—বিশেষভাবে ইউরোপ মহাদেশের বহু স্থান ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছে। উহাতে বেলে পাথর, চূণা পাথর, শিল, নুড়ি, কাদা প্রভৃতির নির্ম্মিত নানা রকম স্তরই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে উহাতে উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী প্রায় পূর্ব্ব যুগের মতই ছিল। অবশ্য জুরাসিক যুগে আরও নানারূপ নূতন প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছিল এবং জলে, স্থলে সমানভাবে জীবজন্তু দেখা দিয়াছিল। গঙ্গা-ফড়িং, কর্‌লা-ফড়িং, গোবরে পোকা, ক্ষেত-ঘুরঘুরে, ঝিনুক, স্পঞ্জ, তারামাছ, বিশেষভাবে প্রবাল-উৎপাদক প্রাণীর আর অবধি ছিল না। পূর্ব্ব যুগে স্তন্যপায়ী প্রাণী যদিও প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই যুগে বহু স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছিল।

সরীসৃপের সংখ্যা এত বেশী এবং তাহাদের আকারও এত নানা

রকমের ছিল যে, এই যুগকে সরীসৃপের যুগ অর্থাৎ পৌরাণিক কূর্ম্মযুগ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই যুগেই পাখী বলিতে প্রকৃতপক্ষে যাহাকে বুঝায়, তাহার প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল। এযুগে খেচর, ভূচর ও জলচর
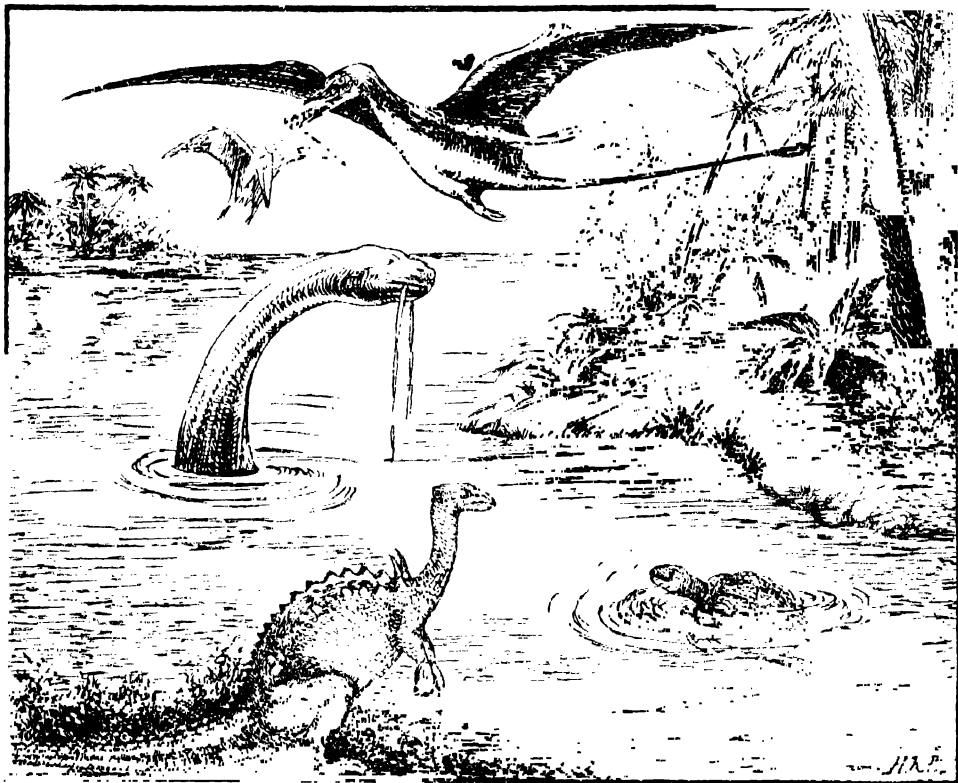
জুরাসিক যুগের পৃথিবীর উপরিভাগের একটি
আনুমানিক দৃশ্য

অদ্ভুত প্রাণীগুলি যখন পৃথিবীতে বিচরণ করিত তখন বাস্তবিকই তাহা এক অদ্ভুত দৃশ্য ছিল। দুঃখের বিষয় তখন সে দৃশ্য দেখিবার কোন লোক ছিল না।

উদ্ভিদ্‌ও এ যুগে পূর্ব্ব যুগের মতই ছিল। ঢেকিশাক, অশ্বপুচ্ছ, পাইন, সাইকাড্‌ প্রভৃতি গাছই তখনও বর্ত্তমান ছিল এবং সম্ভবতঃ উহারা খুবই সতেজ ছিল। বিদ্যাপাতা-বৃক্ষ এখন যাহা চীন, জাপানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের চিহ্ন এ যুগেই প্রথম দেখা গিয়াছে।

ক্রিটেসিয়ান যুগে পৃথিবী

(Cretacean Age)

সাদা চকের স্তর আছে বলিয়াই এ যুগের নাম রাখা হইয়াছে ক্রিটেসিয়ান। বাস্তবিক কিন্তু উহাতে সাদা চকের স্তর যে খুব বেশী আছে তাহা নহে, বরং কমই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থানেই সবুজ বর্ণের বালির কাদা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বালি এবং কাদা এক সময় বড় বড় নদীর মোহনায় বদ্বীপের আকারে সঞ্চিত হইয়াছিল। আর সাদা চক্‌ যে অগভীর সমুদ্রতলেই গঠিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এ যুগে, ইউরোপ মহাদেশের অধিকাংশ স্থানই জলের নীচে নিমজ্জিত ছিল। জলের নীচে ক্রমশঃ জমা হইয়া বেলে পাথর, কাদা অথবা চকের যে পাহাড়গুলি স্থানে স্থানে পৃথক্‌ ভাবে সারা মহাদেশ ব্যাপিয়া গঠিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তৎকালীন সমুদ্র, হ্রদ এবং নদী সমূহের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। অন্যান্য চূণা পাথরের ন্যায় এযুগের চকের স্তরেও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণীর খোলস দেখা যায়। উহাতে তৎকালীন সমুদ্র যে বহু ক্ষুদ্র প্রাণীতে পরিপূর্ণ ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়; তারা মাছ, সাগরাণ্ড (Sea-urchins), স্পঞ্জ, প্রবাল-উৎপাদক প্রাণী ছাড়াও হাঙ্গর, কুকুরমাছ (Dog fish) প্রভৃতি প্রাণীও যথেষ্ট পরিমাণ বর্ত্তমান ছিল। জুরাসিক যুগের ন্যায় এ যুগে সরীসৃপের সংখ্যা খুবই বেশী। তাহাদের

মধ্যে আবার কূর্ম্মচঞ্চু অতিকায়ের (Iguanodon) সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। স্তন্যপায়ী ক্ষুদ্র প্রাণীর চিহ্ন এ যুগেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়।

এযুগের উদ্ভিদ বিশেষ ভাবে দেখা দরকার। কেননা আজকাল যে
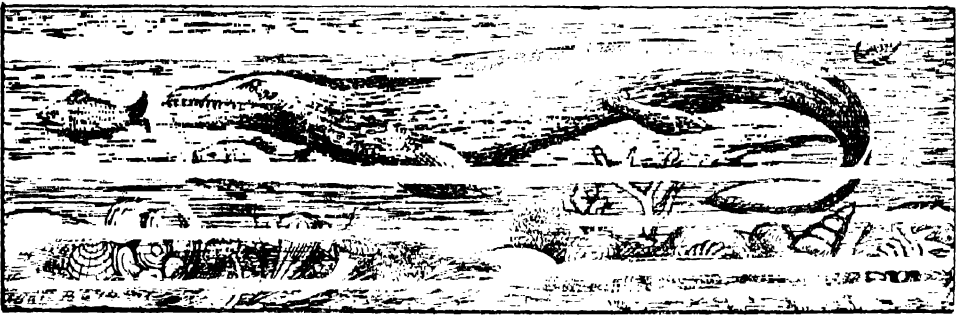
ক্রিটেসিয়ান যুগের পৃথিবীর উপরিভাগ ও জলের
নীচের আনুমানিক দৃশ্য

সকল গাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মত গাছ, সে সময়ের স্তরের ভিতরেও দেখিতে পাওয়া যায়। এযুগের প্রারম্ভে যে সকল স্তর গঠিত হইয়াছে, তাহাতে উহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ অর্থাৎ জুরাসিক

যুগের গাছ, যেমন ঢেঁকিশাক, অশ্বপুচ্ছ, সাইকাড্ ও পাইন গাছের সংখ্যাই বেশী। তাহাতে দ্বিবীজদল গাছের কোন চিহ্ন নাই। এ যুগেরই পরবর্ত্তী সময়ে দ্বিবীজদল গাছপালার সহসা আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহাতে আজকালকার মত পপ্লার, ওক, ডুমুর, উইলো, তাল জাতীয় গাছ এবং অন্যান্য বহু রকমের গাছ যে ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত গরম ও আর্দ্র থাকাতে তৎকালীন উদ্ভিদ্ বেশ সতেজ ও পুষ্ট ছিল।

ইওসিন যুগে পৃথিবী

(Eocene Age)

ইওসিন যুগের স্তর হইতেই পূর্ব্বোক্ত নবজৈবিক স্তরের আরম্ভ। নব-জৈবিক স্তরের বিভাগ প্রধানতঃ দুইটি, টারসিয়ারী (Tertiary) ও কোয়ার্টানারী (Quartenary)। কোয়ার্টানারীর অন্য নাম প্লিষ্টোসিন (Pleistocene); উহার কথা পরে বলা হইবে। টারসিয়ারীর আবার চারিটি বিভাগ আছে; যথা ইওসিন (Eocene), ওলিগোসিন (Oligocene), মাইওসিন (Miocene) এবং প্লাওসিন (Pliocene)।

ক্রিটেসিয়ান যুগের স্তর হইতে ইওসিন যুগের স্তরের প্রকৃতির, সকল বিষয়েই বিশেষ রকম পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সে কারণেই নবজৈবিক স্তরের আরম্ভ এখান হইতেই ধরা হইয়াছে। উহার প্রাণী, উদ্ভিদ্, পাহাড় ইত্যাদিতে পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ক্রিটেসিয়ান যুগের অধিকাংশ পাহাড় সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জলের তলেই নিমজ্জিত ছিল। তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি আবার গভীর সমুদ্রতলে গঠিত হইয়াছিল। ইওসিন যুগে তাহারাই আকারে বড় হইয়া পর্ব্বত এবং স্থলভাগে পরিবর্ত্তিত হইল। মাঝে মাঝে সাগর, হ্রদ, নদীর মোহনা ইত্যাদিও দেখা দিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রার ন্যায় কৌড়ি, শম্বুক প্রভৃতি প্রাণী পরিপূর্ণ সমুদ্রের তলদেশ, কোন কোন স্থানে

দশ-বার হাজার হাত উচ্চে সবলে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পৃথিবীস্তরের এইরূপ ঊর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত হওয়া বাস্তবিকই এক বিস্ময়জনক ব্যাপার।

এই পরিবর্ত্তনের পরে ক্রমশঃ স্তর গঠিত হইয়া ইওসিন যুগে পৃথিবী
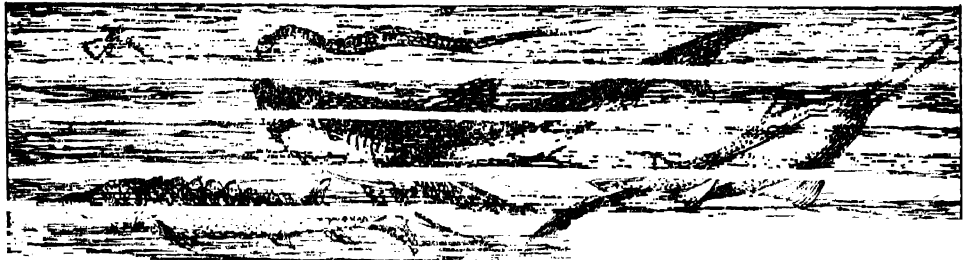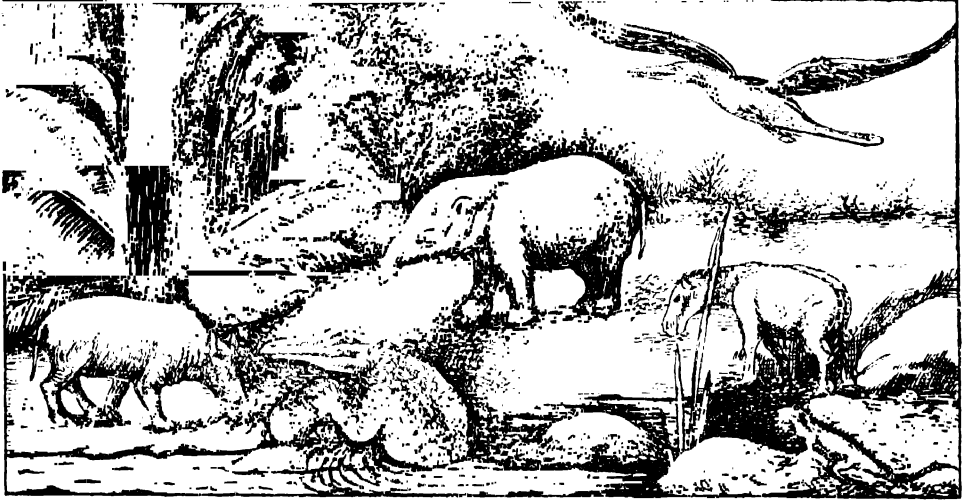
ইওসিন যুগের পৃথিবীর উপরিভাগের ও জলের তলের আনুমানিক দৃশ্য

গঠনের কাজ চলিতেছিল। ইহাতে যে শুধু ধরাপৃষ্ঠের আকারই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা নহে, এই যুগে প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌ও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ হইতে ভিন্ন রকম আকার ধারণ করিয়াছিল। এই যুগের স্তর পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে

পাওয়া যায়। উহার ছয়শত হইতে সাড়ে ছয়শত হাত পুরু স্তর, প্রাণিদেহের খোলস হইতে উৎপন্ন চুণা পাথর হইতেই গঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে পৃথিবীর আমরা যে আকার দেখিতে পাইতেছি এ যুগেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল।

এ সময় পৃথিবীতে নানারকম গাছপালাই যে শুধু দেখা দিয়াছিল তাহা নহে, বহু রকম প্রাণীরও আবির্ভাব হইয়াছিল। বহু স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখী, সরীসৃপ, মাছ, ঝিনুক, পোকা প্রভৃতি দলে দলে পৃথিবীতে বিচরণ করিত। কিন্তু একটা খুবই বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অতিকায় সরীসৃপের কোন চিহ্নই এ যুগের স্তরে দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ তপিরের মত এক প্রকার লুপ্ত প্রাণী এবং ঘোড়ার পূর্ব্বপুরুষের কঙ্কাল উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের পায়ে তখন তিনটি কিংবা চারিটি অঙ্গুলী থাকিত। হাতীর মত বড় নানা রকম অদ্ভুত গণ্ডার এই যুগেই পৃথিবীতে বিচরণ করিত। লেমুরের মত আকার-বিশিষ্ট বানর এ যুগেই প্রথম দেখা দিয়াছিল। ল্যাজহীন বানরের উৎপত্তিও এ যুগেই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

ইওসিনের পরেই ওলিগোসিন (Oligocene) যুগ। ইওসিন যুগের স্তরের সঙ্গে উহার স্তরের প্রায় সকল বিষয়েই সাদৃশ্য এত বেশী যে, তাহা হইতে এ যুগের পার্থক্য ধরাই কঠিন। প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ এই উভয় যুগেই প্রায় একরূপ। কিন্তু মুদ্রাকারের ক্ষুদ্র প্রাণীর (Nummulites) সংখ্যা এযুগে খুবই কমিয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের স্থান অসংখ্য পোকায় অধিকার করিয়াছিল; সর্প, কুম্ভীর ও পলিওথেরিয়ামের কঙ্কাল উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ওলিগোসিন যুগের পর মাইওসিন (Miocene) যুগ। এযুগের স্তর পৃথিবীর বহু স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নততর ও নূতন প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ এ যুগে আবির্ভূত হইয়াছিল। বিড়াল, শূকর, কৃষ্ণসার ও শিম্পাঞ্জির মত বড় বড় ল্যাজহীন বানর এ সময়েই দেখা দিয়াছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ যুগের স্তরে কোন মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই। সুবৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীর চিহ্ন এ যুগের মত আর কোন যুগেই দেখা যায় না।

প্লাওসিন ও প্লিষ্টোসিন যুগে পৃথিবী

(The Pliocene and the Pleistocene Age)

ভূতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্লাওসিন ও প্লিষ্টোসিন যুগকে নবজৈবিক বিভাগের দুইটি পৃথক্ অংশ বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু উভয় যুগের স্তরের মধ্যেই
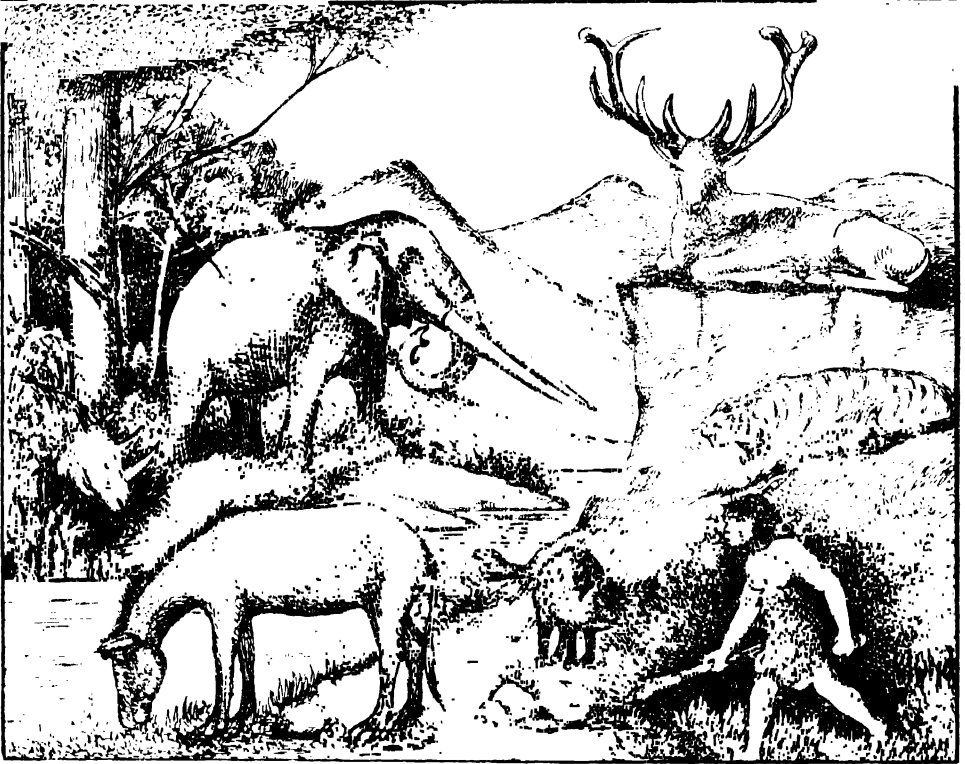
প্লাওসিন যুগের পৃথিবীর উপরকার একটি আনুমানিক দৃশ্য

মানুষের চিহ্ন পাওয়া যায়। প্লাওসিন ও প্লিষ্টোসিন যুগের প্রাণী অনেকাংশে উহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগেরই অনুরূপ। মানুষ এবং আদি জলচর স্তন্যপায়ী
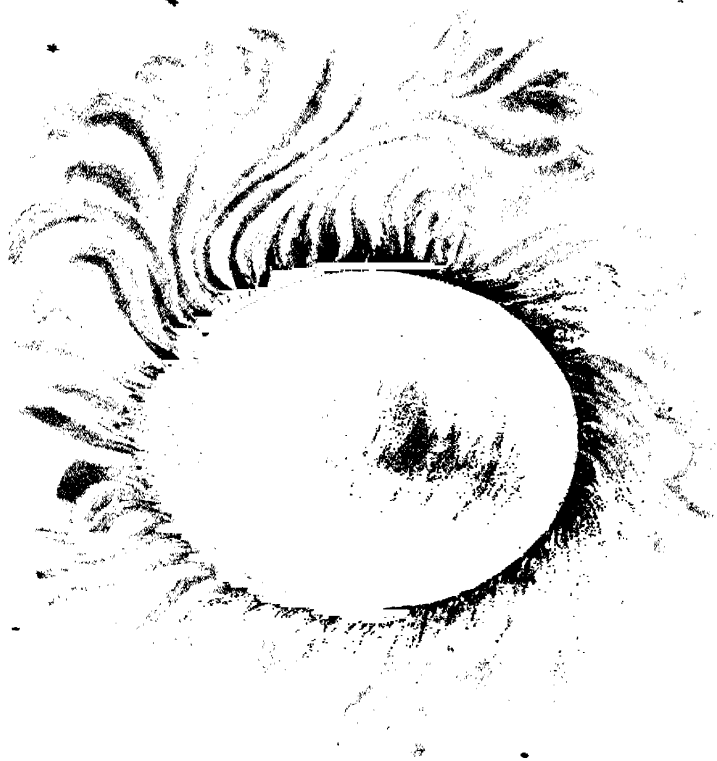
তপ্ত গোলক হ'তে ভূলোক হ'ল গড়া   [পৃঃ—৭০

প্রাণী শুশুকের এসময়েই পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল। সে-সময়কার মানুষের ব্যবহৃত বহু পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। যবদ্বীপে বানরাকৃতি আদি মানবের (Pithecanthropus Erectus) মাথার খুলি পাওয়া গিয়াছে। এসকল প্রমাণ হইতেই তখনকার দিনে পৃথিবীতে যে মানব ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। এ যুগের শেষের দিকেই পৃথিবীর আবহাওয়া ক্রমশঃ শীতল হইতেও শীতলতর হইতেছিল। তারপর প্লিষ্টোসিন যুগে শীতের পরিমাণ এতই বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ইউরোপ মহাদেশের প্রায় সমুদয় উত্তরাংশ একেবারে বরফে আবৃত হইয়া গিয়াছিল। কানাডা এবং আমেরিকার পূর্ব্বাংশের দেশগুলিও তখন গভীর বরফের ভিতর নিমজ্জিত ছিল।

এখন আমরা যে স্তরের উপর বাস করিতেছি প্লিষ্টোসিন (Pleistocene) যুগেই তাহার আরম্ভ। এযুগে উত্তাপের অভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানই বরফে আবৃত হইয়া গিয়াছিল, তাহাতেই উহাকে উহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ হইতে পৃথক্ বলিয়া ধরা হইয়াছে। তাহা না হইলে অন্যান্য বিষয়ে উহাদের তফাৎ খুবই কম। বরফের আধিক্য হেতুই এ যুগের অন্য নাম তুষার যুগ (Ice Age)। প্রাকৃতিক এই ভীষণ পরিবর্ত্তনের মধ্যেও মানুষ যে বাঁচিয়াছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ তাহাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র এই যুগের স্তরের ভিতরই পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া পিল্ট্ডাউন (Piltdown), হিডেল-বার্গ (Heidelburg) এবং রোডেসিয়ান (Rhodesian) মানবের মাথার খুলি হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক বিপদ্ ছাড়া বন্য জন্তুর উৎপাতও তখন কম ছিল না। বন্য হাতী, মেমথ, গণ্ডার, জলহস্তী, গুহাবাসী ভল্লুক, হায়েনা, বন্য বাইসন, বল্গা হরিণ প্রভৃতি প্রাণী তখন পৃথিবীতে বিচরণ করিত। উহাদিগকে বধ করিয়া তাহাদিগকে আত্মরক্ষা এবং খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইত। সেই যুগের পৃথিবীই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইয়া বর্ত্তমান যুগের পৃথিবী গঠিত হইয়াছে। মেমথ, অসিদন্ত ব্যাঘ্র চিরতরে লোপ পাইয়াছে। অন্যান্য

কতকগুলি প্রাণীর ন্যায় নেকড়ে বাঘও আজ ধ্বংসের মুখে। এমন কি, কোন কোন প্রাচীন মানবজাতিও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সেই পরিবর্ত্তন এখনও চলিতেছে। পাহাড়-পর্ব্বত ক্ষয় হইয়া ক্রমশঃই সাগরের দিকে যাইতেছে। এমন একদিন আসিবে যখন বর্ত্তমানের পৃথিবীর কথাও প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক আশ্চর্য্য গল্পের মত, তখনকার ছেলেমেয়েরাও তোমাদের মতই কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া আলোচনা করিবে।

শীতল হ'য়ে ক্রমে তপ্ত গোলক হ'তে
ভূলোক হ'ল গড়া,
এরূপভাবে ক্রমে তাপ যদি যায় ক'মে
কেমন হবে ধরা?

পৃথিবী যে যে পদার্থ নিয়া সৃষ্টির আদিতে সূর্য্য হইতে পৃথক্ হইয়াছিল, এখনও সে সকল পদার্থই ইহাতে বর্ত্তমান আছে। সময়ের পরিবর্ত্তনে তাহারা এখন পরস্পর নানাভাবে মিশ্রিত এবং পরিবর্ত্তিত হইয়া পৃথিবীর যাহা কিছু সকলই উৎপাদন করিয়াছে। সেই আদিযুগ হইতেই পৃথিবী ক্রমশঃ শীতল হইতে শীতলতর হইতেছে বলিয়াই এই পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইয়াছে। সেই সময়কার ভীষণ উত্তাপের হ্রাস না হইলে পৃথিবীর বর্ত্তমান আকার এবং অবস্থা কখনই সম্ভবপর হইত না। এখন এই উত্তাপ হ্রাস হইতে হইতে এমন একদিন আসিতে পারে, যখন সকলই একেবারে শীতল হইয়া যাইবে। তখন পৃথিবীর অবস্থা কি হইবে একবার ভাবিয়া দেখ। পৃথিবী উদ্ভিদ্ ও প্রাণী শূন্য হইয়া নির্জীব জড়পদার্থে পরিণত হইয়া যাইবে। পৃথিবী হইতে উৎপন্ন চন্দ্র, আকারে ছোট বলিয়া শীঘ্রই উত্তাপহীন এবং জীবহীন জড়পদার্থে পরিণত হইয়া গিয়াছে। পরিমিত উত্তাপের অভাবে কোন প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ্ বাঁচিতে পারে না। তোমরা হয়ত বলিবে যে,

পৃথিবী নিজের উত্তাপ হারাইলেও, সূর্য্য হইতে উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বদাই উত্তপ্ত থাকিবে; কখনই একেবারে শীতল হইয়া যাইবে না। একথা অবশ্য এক হিসাবে সত্য। কেননা পৃথিবী দিনের বেলা সূর্য্য হইতে যে উত্তাপ সংগ্রহ করে, প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের বাঁচিয়া থাকার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু রাত্রিবেলা সেই উত্তাপ বাহির হইয়া যায় বলিয়া, পৃথিবীর নিজের কোন উত্তাপ না থাকিলে একদম উত্তাপহীন হইয়া যাওয়ার কথা। সুতরাং শুধু সূর্য্যের উত্তাপের উপর নির্ভর করিলে পৃথিবী একদিন যে উত্তাপের অভাবে জীবহীন হইয়া যাইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক কিন্তু সে ভয়ের বিশেষ কোন কারণ নাই। কয়েক বৎসর হইল, পৃথিবীর উপাদানে রেডিয়াম (Radium) নামক একটি অতি আশ্চর্য্য পদার্থের অস্তিত্বের কথা জানা গিয়াছে। উহার একটি প্রধান গুণ এই যে, উহা নিজে নষ্ট না হইয়াও সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত উত্তাপ উৎপাদন করিতে পারে। পৃথিবীর আর কোন পদার্থই ধ্বংস না হইয়া উত্তাপের সৃষ্টি করিতে পারে না। বিশাল পৃথিবীর উপাদানে উহার পরিমাণ খুবই কম। পরিমাণ সামান্য হইলেও উহার শক্তি অসাধারণ। পৃথিবীতে উহার পরিমাণ বেশী থাকিলে, পৃথিবী এত উত্তপ্ত হইত যে, পৃথিবীতে বাস করাই কঠিন হইত। পৃথিবীর উপাদানে যতদিন রেডিয়াম থাকিবে ততদিন পৃথিবী একেবার শীতল হইয়া যাওয়ার কোন আশঙ্কা নাই। সম্প্রতি কানাডা রাজ্যে এই অত্যাশ্চর্য্য মূল্যবান্ পদার্থ কিছু বেশী পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতে, তোমাদের মধ্যেও যে কেহ কেহ ইহা আবিষ্কার করিয়া, দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? এই অত্যাশ্চর্য্য জিনিসের সকল কথা বলা এখানে সম্ভবপর নহে। অতঃপর ইহার বিষয় আলোচনা করিলে তোমরা পৃথিবীর অতীত সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব জানিতে পারিবে।

অতীতের কথা

(ওদের) আকার শুধু হয় নি বদল
পূর্ব্বগতি নাই,
কি যে হবে ভবিষ্যতে
এখন ভাব তাই।

প্রাচীনতম যুগে চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীর গতির বেগও বর্ত্তমানের চেয়ে অনেক গুণে বেশী ছিল। জ্যোতির্ব্বিদগণ যুক্তি-তর্ক এবং গণনাদ্বারা এমন ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের এই কথা এখন আর অবিশ্বাস করা চলে না। সূর্য্যকে যদিও এপর্য্যন্ত বেশ জ্বলন্ত অবস্থাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাঁহাদের মতে উহা দিন দিনই ক্রমশঃ শীতল হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে উহার গতিও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। সূর্য্যের উত্তাপ যেমন ধীরে ধীরে কমিতেছে তেমনি দিবাভাগের পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। এমন একদিন গিয়াছে যখন দিবাভাগের পরিমাণ, বর্ত্তমানের দিনের অর্দ্ধেক অথবা তিন-ভাগের একভাগ মাত্র ছিল। ইহার পর আবার ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিবে যখনকার একদিনের পরিমাণ, বর্ত্তমানের এক বৎসরের সমান হইবে। সেই সময় সূর্য্য আলোকরশ্মি হারাইয়া সম্ভবতঃ আকাশে ঝুলিতে থাকিবে। সূর্য্য উত্তাপহীন অবস্থাতে উপনীত হওয়ার সময় পৃথিবীর উত্তাপ রক্ষাকল্পে রেডিয়াম নামক পদার্থ হয়ত কিছুকাল পৃথিবীর উত্তাপ রক্ষা করিবে। তারপর পৃথিবীও সেই সূর্য্যের অবস্থাই প্রাপ্ত হইবে। পৃথিবীর সেরূপ অবস্থা হইতে এখনও অবশ্য লক্ষ লক্ষ বৎসর দেরী আছে।

নীহারিকা হইতে সূর্য্য ও সৌরজগতের উৎপত্তি, সূর্য্য হইতে পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি, সৌরজগতে পৃথিবীর স্থান, মোটামুটিভাবে এসকল কথা তোমাদিগের নিকট বলা হইল। যে সকল বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের সাধনার ফলস্বরূপ আজ আমরা পৃথিবী সম্বন্ধে এত কথা জানিতে পারিয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ।

এই আলোচনা হইতে তোমরা একথা বেশ বুঝিতে পারিয়াছ যে, স্থাবর-জঙ্গম পৃথিবীর যা কিছু, সকলই আমরা সূর্য্য হইতে লাভ করিয়াছি। অনন্ত শক্তির আধার ভগবান নীহারিকা সৃষ্টি করিয়া, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসরব্যাপী পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া, সূর্য্য হইতে বিচিত্রভাবে আমাদের এই ধরাকে গঠন করিয়াছেন। সূর্য্যে তাঁহার শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাই আর্য্য ঋষিগণ সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া, ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার জ্বলন্ত ও প্রত্যক্ষ শক্তি সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। সকল সৃষ্টির মূলাধার সেই ভগবানের চরণে কোটি কোটি নমস্কার।

অঙ্গারক ; বা পাথর কয়লার যুগের অরণ্যের একটি দৃশ্য

অতীতের কথা

পৃথিবীর নানা মত স্তর,
অতীতের যেন যাত্নঘর।

পাহাড়-পর্ব্বতের স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া বালি পাথর, চূণা পাথর, শিল, নুড়ি—এমন কি ঘরের দেওয়াল পর্য্যন্ত, যাহা কিছুই হউক না, সাধারণ ভাবে দেখিলেও, তাহার ভিতর অতীতের প্রাণী এবং উদ্ভিদের শিলীভূত দেহের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে তাহাদের আকার তেমন পরিষ্কাররূপে ধরা যায় না সত্য, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে প্রায় সব সময়েই বুঝিতে পারা যায় যে, উহারা প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ্। আবার কোন কোন স্থানে অতীত যুগের ঝিনুক, শামুক ইত্যাদির খোলস এমনভাবে সুরক্ষিত

আছে যে, তাহা দেখিলে সমুদ্রতীরের সেদিনকার ঝিনুক, শামুক বলিয়া মনে হয়। প্রাণিদেহের খোলস, অস্থি, কঙ্কাল, গাছের ডালপালা, এমন কি ঢেকিশাকের পাতার অসম্পূর্ণ চিহ্ন অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল দেখিয়া কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই, উহারা যে এক সময় জীবন্ত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন না।

পুরাকালেও পৃথিবীর স্তরের ভিতরে উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর দেহাবশেষ তৎকালীন বুদ্ধিমান্ মানুষের যে একেবারে চক্ষে পড়ে নাই তাহা নহে। তাঁহারাও এসকল শিলীভূত দেহ পৃথিবীর স্তরে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের নিকট এসকলের অর্থ ছিল অন্য রকম। মহাপ্রলয়ে পৃথিবী ধ্বংসের সময় জলপ্লাবনে যে সকল অদ্ভুত প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ্ জলে ডুবিয়া ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল, এসকল তাহাদেরই দেহাবশেষ। এরূপ নানা মত অদ্ভুত ধারণা তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল ছিল বলিয়া, ইহার বেশী খবর জানিতে তাঁহাদের আগ্রহ হয় নাই। তারপর পৃথিবীর প্রস্তরীভূত বিভিন্ন স্তর, যে কোন কারণেই হউক, মানুষ যতই খনন করিতে লাগিল ততই এই সকল বিভিন্ন স্তরে নানা রকম উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর দেহাবশেষ তাহাদের দৃষ্টি-গোচর হইতেছিল। তাহাদের মধ্যে পরিচিত এবং অপরিচিত প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের অভাব ছিল না। তাহা ছাড়া প্রত্যেক স্তরেই উহার নিজস্ব বিশেষ বিশেষ প্রাণী এবং উদ্ভিদের শিলীভূত দেহ দেখা যাইতে লাগিল। ফলে মানুষের পূর্ব্ব ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া মনে সন্দেহের উদয় হইল। যুগে যুগে ধরাপৃষ্ঠে যে নূতন প্রাণীর আবির্ভাব এবং তিরোভাব হইয়াছিল, বিশেষতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন যুগের প্রাণী এবং উদ্ভিদের যে এক-একটি যাদুঘর বলিলেই হয়, তাহা বুদ্ধিমান্ লোক মাত্রেই বুঝিতে পারিলেন। তখন হইতে অতীতের গাছপালা এবং প্রাণীর কথা জানিবার জন্য তাঁহাদের আগ্রহ হইল। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে উইলিয়াম স্মিথ (Dr. William Smith) এ সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধানের ফল সাধারণের

নিকট প্রকাশ করেন। এজন্য তাঁহাকে ভূতত্ত্ব-অনুশীলনের প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। সেই হইতে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ নানা স্থানে ভূতত্ত্বের অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। সেই অনুসন্ধানের ফলেই আজ আমরা অতীতের গাছপালা এবং প্রাণী সম্বন্ধে বহু অভিনব খবর জানিতে পারিয়াছি। এ বিষয়ে যে সকল কথা তোমাদের বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না এবং রূপকথারই মত তোমাদের মনে আনন্দ দান করিবে, সে সকল কথাই এখানে সংক্ষেপে বলা হইল।

জল-বাতাসে গাছ বেঁচে রয়,
প্রাণীর জীবন গাছে,
তাই মনে হয় গাছই আদি—
প্রাণীর জন্ম পাছে।

কখন কি ভাবে এবং কি আকারে যে এই জড় ধরার বুকে প্রথমতঃ জীবন্ত পদার্থের আবির্ভাব হইয়াছিল, আজ পর্য্যন্তও অভ্রান্তরূপে কেহ তাহা বলিতে পারেন না। অতীতের যে সকল প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ তাহা হইতে এবিষয়ে নানারূপ অনুমান করিয়া থাকেন। অতীতের পৃথিবীর কথা আলোচনাকালে পূর্ব্বেও তাহা বলা হইয়াছে। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় সূর্য্যের আলোকে আলোকিত যে সকল অগভীর জলাশয় ছিল, তাহাতে শেওলার মত পিচ্ছিল জীবন্ত পদার্থই যে প্রথম জন্মিয়াছিল, অন্ততঃ সে বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানিগণের মতভেদ নাই। তারপর অন্য কারণেও পৃথিবীতে উদ্ভিদের জন্ম যে প্রাণীর জন্মের পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কেননা উদ্ভিদ্ই কেবলমাত্র জল এবং বায়ুর উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে পারে, প্রাণী তাহা পারে না। প্রাণী মাত্রেরই সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষভাবে

জীবনধারণের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়; সুতরাং উদ্ভিদের জন্মই প্রথম হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে পৃথিবীতে যাহা কিছু জীবন্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের সকলেরই আদি যে উদ্ভিদ্ তাহা বলা যাইতে পারে।

সেই অতীতে পৃথিবীর উপর যখন জীবন্ত পদার্থের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন পৃথিবীর আবহাওয়া এখন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ছিল। পুঞ্জীভূত মেঘরাশি তখন প্রায় সর্ব্বদাই সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিত। আর পৃথিবীর উপর দিয়া সদাসর্ব্বদাই ঝড়বৃষ্টি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত। আগ্নেয়গিরি প্রবল শক্তিতে গলিত লাভা ও ধাতব পদার্থ ভূগর্ভ হইতে উদ্গিরণ করিত। যে স্থলভাগ তখন বর্ত্তমান ছিল তাহাতে মাটির কোন চিহ্নও ছিল না, যাহা ছিল তাহাও নিতান্ত অনুর্ব্বর, সুতরাং গাছপালা জন্মিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল। অবিরাম ঝড়বৃষ্টির স্রোত প্রভূত পলির (loads of sediment) বোঝাই বহন করিয়া নিয়া যাইত। তাহাই আবার তখনকার নদী-নালা বহন করিয়া সাগরের দিকে ধাবিত হইত। এই পলিই প্রথমতঃ কাদা ও পরে ক্রমশঃ কঠিন হইয়া নানা শ্রেণীর পাথরের স্তর গঠন করিয়াছিল।

সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীতে শেওলা রূপে যে উদ্ভিদের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা এত কোমল এবং আকারে এত ক্ষুদ্র ছিল যে, সেই সময়কার স্তরে এখন আর তাহাদের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তখনকার সেই উদ্ভিদের সম্পূর্ণ বিবরণ জানা এখন প্রায় একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। সেই শেওলার মত আদি জীবন্ত পদার্থেরও বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, জল, বায়ু ও আলোকের নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া, তাহারা সমুদ্রের কিনারায় অগভীর জলে ভাসমান অবস্থায় দেখা দিয়াছিল। কেননা আলোকই তাহাদের প্রাণ; আলোক ব্যতীত তাহারা বাঁচিতে পারে না।

ডাঙ্গার উপর বাস করিতে
সবল দেহ চাই,
গাছের ভিতর কঠিন কাঠের
গঠন হ'ল তাই।

সমুদ্রের ধারে জলের সীমানা যেখানেই থাকুক না কেন, সেই শেওলার মত জীবন্ত পদার্থ সমুদ্রের ধারে, জলের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিত। কোন মতে জল ছাড়া হইলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। জল হইতে পৃথক করিলে বর্ত্তমানে মাছের যে অবস্থা ঘটে তাহাদেরও সেই অবস্থা হইত। জলের অভাব হইলে তাহাদের আত্মরক্ষার কোন উপায়ই ছিল না। তখনকার প্রবল জল-ঝড় ও স্রোতের বেগে এবং জোয়ার-ভাটার দরুণ, প্রায় সব সময়েই তাহাদের ডাঙ্গায় আবদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অথচ সমুদ্রের গভীর জলের তলদেশে বাস করিলে আলোক ও বায়ু, যাহা তাহাদের জীবনধারণের অন্য দুইটি অতি আবশ্যকীয় জিনিস, তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। সুতরাং তোমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, অগভীর জলাশয়ে ও সমুদ্রের কিনারায় বাস করা ছাড়া তাহাদের আর অন্য গতি ছিল না। তখন সেই বিপজ্জনক অবস্থা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ক্রমশঃ তাহাদের দেহের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল।

তারপর যে সকল সামুদ্রিক উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়াছিল, জোয়ার-ভাটার মধ্যেও যাহাতে উজ্জ্বল সূর্য্যালোকের ভিতর স্থান পাইতে পারে, তাহার জন্য তাহাদের ভিতরের অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রথমতঃ কাষ্ঠময় সূতা (woody fibre) গঠিত হইল। ইহাতে তাহাদের একটা মস্ত বড় সুবিধা হইল। এরূপভাবে দৃঢ়তর হইয়া তাহারা যে শক্তি লাভ করিয়াছিল, সেই শক্তির বলে তাহারা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত এবং যে সূর্য্যালোক তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা তাহাদের সুলভ হইয়া-

ছিল। এক প্রকার কোমল বীজের (spores) দ্বারাই তৎকালে এই সকল উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি হইত। সেই বীজ জলের মধ্যেই ঝরিয়া পড়িত, জলের দ্বারাই ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইত এবং জলের নীচেই চারা উৎপাদন করিত। এইরূপে উদ্ভিদ্-জীবন প্রথমতঃ লক্ষ লক্ষ বৎসর জলের ভিতরেই আবদ্ধ ছিল। তারপর কালক্রমে এই কোমল বীজের উপর উন্নততর কঠিন আবরণের সৃষ্টি হইল তাহাতে এই সুবিধা হইল যে, বীজগুলির জলাভাবে নষ্ট হইবার আশঙ্কা তিরোহিত হইল এবং চার উৎপাদনের জন্য জলের নীচে ডুবিয়া থাকার আর কোন দরকার রহিল না। তখন সেই বীজ সমুদ্র-জলের সীমার বাহিরে, অর্থাৎ সমুদ্রতরঙ্গের অত্যাচার হইতে দূরে, নিরাপদ্ স্থানে, চারা উৎপাদন করিতে লাগিল।
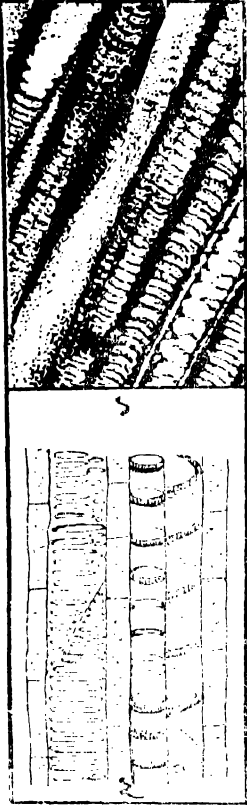
প্রাচীন যুগের গাছের ভিতরে কাঠের গঠন

১। প্রাচীন স্তরে উহার শিলীভূত আকার

২। উহারই পরিষ্কৃত অন্য আর একটি চিত্র।

ক্রমশঃ উদ্ভিদ্-দেহের ভিতর একদিকে যেমন কাঠের সূতা ও জল-বহনকারী নলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনি আবার অন্যদিকে বীজের জলাভাব সহ্য করিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইল। উচ্চশ্রেণীর গাছগুলি এইরূপে কালক্রমে জলীয় জীবন অতিক্রম করিয়া স্থলভাগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। আকারে এবং গঠনে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহারা অনেকেই বর্ত্তমানে এমন অবস্থা লাভ করিয়াছে যে, ভূমির সামান্য জলই এখন তাহাদের জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট। ইহা ত তোমরা সকলেই দেখিতেছ। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্ কিন্তু এখনও জলেই জন্মে। এমন কি

মস্ (Moss) জাতীয় গাছ, যাহা নিম্নশ্রেণীর হইলেও নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর নয়, আজ পর্য্যন্তও আর্দ্র সেঁৎসেঁতে জায়গা ছাড়া জন্মিতে পারে না।

ধীরে ধীরে হইলেও, নানা জাতীয় বহু উদ্ভিদ্ দলে দলে সমুদ্র হইতে নিম্ন ভূমির উপর কালক্রমে স্থান লাভ করিয়াছিল। বহু স্থানে বিস্তৃত হইয়া এখন তাহারা খাল, বিল প্রভৃতি জলা ভূমিতে বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমানে সামুদ্রিক এবং সাধারণ জলীয় উদ্ভিদে যে পার্থক্য দেখা যায়, সম্ভবতঃ পূর্ব্বে তাহা ছিল না। তখন সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণ এখনকার চাইতে খুব সম্ভব কম ছিল।

কোথায় শুধু ছাঁচই আছে
গাছের যা সব লোপ,
হাজার কোটি গাছ ধরেছে
পাথর কয়লার রূপ।

উদ্ভিদের এই ক্রমোন্নতির পথে কত রকম উদ্ভিদের যে আবির্ভাব এবং তিরোভাব হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বহু লুপ্ত উদ্ভিদ্ এখনও ভূগর্ভে পাথরের স্তরের ভিতরে ও কয়লার খনি প্রভৃতিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে বর্ত্তমান আছে। এপর্য্যন্ত শিলীভূত এবং লুপ্ত যে সকল উদ্ভিদ্ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে তাহাদের আকৃতি, গঠন এবং তাহারা কোন্ শ্রেণীর উদ্ভিদ্ তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। পাথর কয়লার যুগের (Coal Measure Period) একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের বিস্তৃত শিকড় সমেত কাণ্ড পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলেই উহা জীবন্ত অবস্থায় যে একটি বিশাল বৃক্ষ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। দেখিতে যদিও উহা ছালসংযুক্ত শিলীভূত গাছ বলিয়াই মনে হয়, বাস্তবিক কিন্তু উহাতে
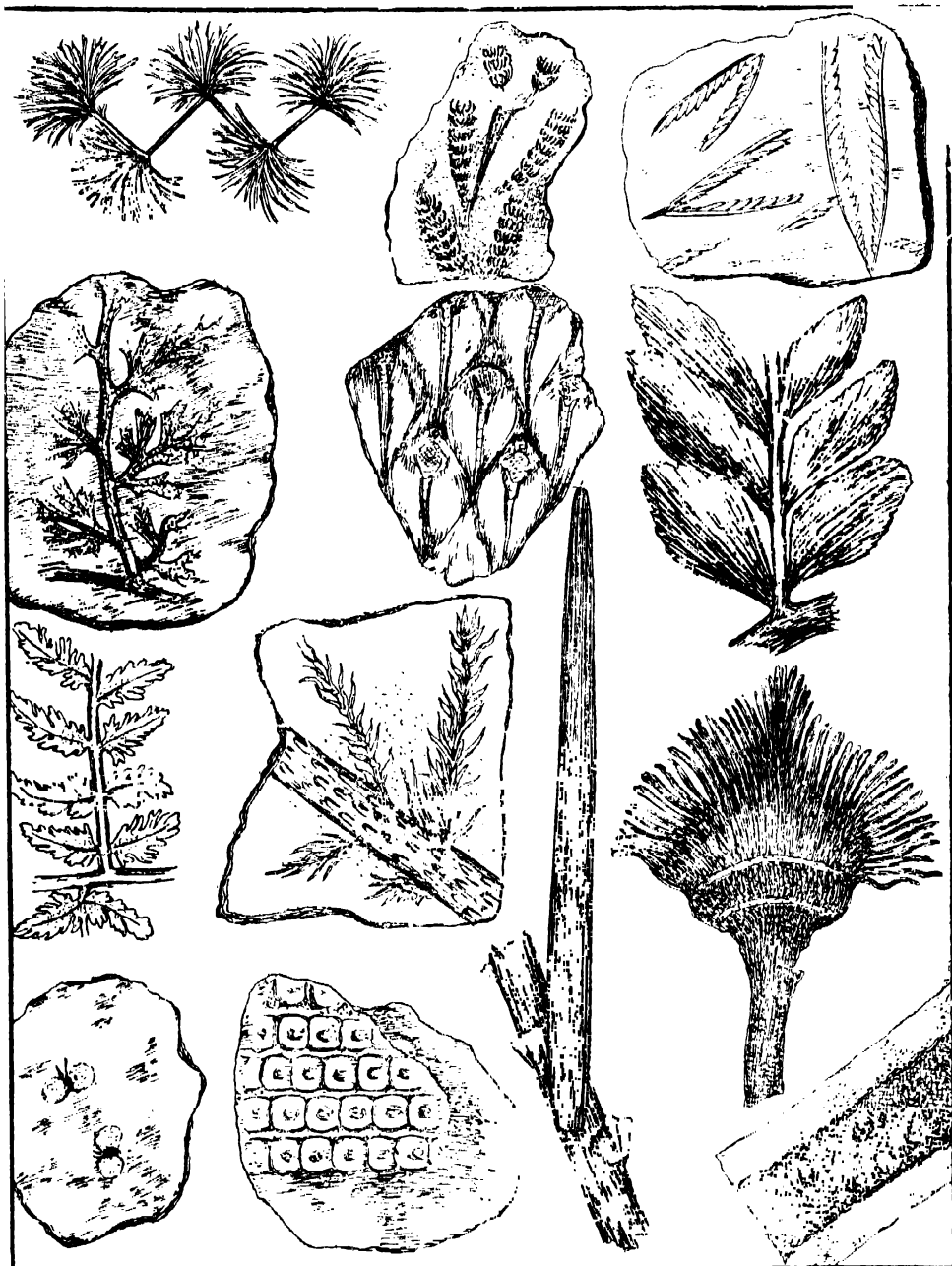
পৃথিবীর প্রাচীনস্তরে বিভিন্ন উদ্ভিদের নানাপ্রকার চিহ্ন

আদত গাছের প্রায় কোন পদার্থই বিদ্যমান নাই; ভিতরেরসমুদ য় অংশই পাথরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কাঠের আর কোন অংশই তাহাতে নাই, যাহা কিছু আছে তাহা সকলই পাথর। প্রকৃতপক্ষে উহা সেই গাছের ছাঁচ ছাড়া আর কিছুই নহে। কথাটা উদাহরণ দ্বারা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেছি। তাহা না হইলে তোমাদের মধ্যে কাহারও হয়ত বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হইতে পারে। কোন জিনিসের ছাঁচ তৈয়ার করিবার সময়, কুম্ভকার যেমন একটু একটু করিয়া জিনিসটির চারিদিকে মাটি জড়াইয়া থাকে, তেমনি জলে নিমজ্জিত এই গাছের কাণ্ড ও শিকরের চারিদিকে বালি ও কাদা ক্রমশঃ জমা হইয়া প্রথমতঃ গাছের কঠিন আবরণ বা ছাঁচ প্রস্তুত হইয়াছিল। তারপর উহার ভিতরে, গাছের ছাল, কাঠ, যাহা কিছু সবই পচিয়া গলিয়া ধ্বংস হইয়া গিয়া যখন উহা শূন্যগর্ভ অর্থাৎ খোলা হইয়া গেল তখন মিহি পলিমাটিতে ক্রমে ক্রমে পুনরায় সেই শূন্য স্থান পূর্ণ হইল। সেই পলিমাটি সহস্র সহস্র যুগযুগান্তর একই ভাবে বিদ্যমান থাকাতে জমিয়া পাথর হইয়া গিয়াছে। এখন ছাঁচের ভিতরে সেই গাছের পূর্ণ অবয়ব পাথরের আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। নানা রকম গাছের বিভিন্ন অংশের পাথরের এরূপ বহু ছাঁচ আবিষ্কৃত হইতেছে।

যে সকল উদ্ভিদ্ কিংবা উদ্ভিদের অংশ নিতান্ত কোমল তাহাই একেবারে ধ্বংস হইয়া তাহার স্থানে পাথর গঠিত হইয়াছে। সকল গাছেরই অন্ততঃ পাতাগুলি নিতান্ত কোমল ছিল বলিয়া, পাতা এবং পাতার মূলের এরূপ ছাঁচ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন গাছে কাঠের চুঙ্গীর ভিতরে পাথর জমান দেখা গিয়া থাকে। এসকল গাছের কাণ্ড কোমল পদার্থে পূর্ণ ছিল বলিয়া তাহাদের এই পরিবর্ত্তন। কাণ্ডের ভিতর কঠিন কাঠে পরিপূর্ণ থাকিলে তাহাদের ভিতরে এরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইত না। যে সকল ফল কিংবা বীজে কঠিন আবরণ বিদ্যমান ছিল, তাহাদের সেই আবরণের ভিতরকার কোমল অংশ নষ্ট হইয়া তাহার স্থান জমান পাথরে অধিকার করিয়াছে।

এরূপ শিলীভূত উদ্ভিদ্ হইতে তাহাদের বাহ্যিক আকারের ধারণা করা যায় সত্য, কিন্তু আভ্যন্তরিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের আকার, বিন্যাস প্রভৃতির বিষয় কিছুই ধারণা করা যায় না।

কখন কখন শিলীভূত এরূপ পরিষ্কার উদ্ভিদ্ও পাওয়া যায় যে, তাহা হইতে খোসা ছাড়াইয়া রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা ধৌত করিলে, অঙ্গারীয় পদার্থ দূর হইয়া আদত জিনিস দেখা যায়। এমন কি অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিলে সেই পরিষ্কৃত খোসার প্রত্যেকটি কোষের আকার দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা যাদুঘরের ভূতত্ত্ব-বিভাগে রক্ষিত কতকগুলি পাথরের উপর কালরঙ্গে চিত্রিত, ঢেকিশাকের পাতার ন্যায় পাতা দেখিতে পাইবে। উহারাও সেই অতীতের উদ্ভিদের নিদর্শন। অতীতে স্তরের ভিতর এই জাতীয় গাছের পাতা যে চাপা পড়িয়াছিল তাহা অংশতঃ পচিয়া গিয়া এই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অঙ্গার উৎপত্তির দরুণই পাথরের উপর এরূপ কাল দাগ পড়িয়াছে। সময় সময় পাতার এই কাল পরত পাথর হইতে অক্ষতরূপে পৃথক্ করা যায়। উদ্ভিদের কোন কোন অংশ মাটির ঢেলার (nodules) ভিতরও সুরক্ষিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। একটু লক্ষ্য করিলেই যাদুঘরের পূর্ব্বোক্ত বিভাগেই খুব লম্বা এবং মস্তবড় একটি শিলীভূত গাছ দেখিতে পাইবে। উহা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ-কর্ত্তৃক যাদুঘরে রাখিয়া দিবার জন্য দান করা হইয়াছে। তাঁহারা উহা আসানসোলের নিকটবর্ত্তী রাণীগঞ্জের নিম্ন গণ্ডয়োনা স্তর (Lower Gondwana system) হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উহা আদতে বাষট্টি হাত লম্বা ছিল। সম্ভবতঃ স্রোতের বেগে ভাসিয়া আসিয়া উহা এই স্থানে নিমজ্জিত হইয়াছিল। উহা দেখিলে তোমরা শিলীভূত গাছের একটা ধারণা করিতে পারিবে।

অতীতের উদ্ভিদ্ সাধারণতঃ স্তরের মধ্যে কি ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় সংক্ষেপে এখানে তাহা বলা হইল। তাহা ছাড়া কয়লার খনিতেও প্রাচীন গাছের প্রচুর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অতীতের সহস্র সহস্র বৎসরে

গঠিত স্তরের চাপে পড়িয়া সে সময়কার উদ্ভিদ্ পাথর কয়লাতে পরিণত হইয়া আছে। সুতরাং কয়লার খনিতে প্রাচীন উদ্ভিদ্ পরীক্ষা করিয়া দেখার বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায়। একথা তোমরা মনে রাখিবে যে, কোন গাছ দীর্ঘকাল শুধু চাপা পড়িয়া থাকিলেই পাথর কয়লাতে পরিণত হয় না। গাছের জাতি, তাহাদের উপর উত্তাপ ও চাপের পরিমাণ, যে লোনা জল উহাদের ভিতর দিয়া চুয়াইয়া গিয়াছে তাহাতে নুনের পরিমাণ ইত্যাদি অনেক কিছুর উপরেই কয়লার উৎপত্তি নির্ভর করিয়া থাকে। পাথর কয়লা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ ; কিন্তু সাধারণভাবে দেখিয়া, উহা যে এক সময় জীবন্ত উদ্ভিদ্ ছিল তাহার একটা ধারণা করিতে পারিবে না। এখন গাছ এবং তাহা হইতে উৎপন্ন পাথর কয়লাতে যে কি প্রভেদ তাহা তোমাদের একটু জানা দরকার। গাছের দেহ বহু যৌগিক এবং মৌলিক পদার্থের সমবায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু পাথর কয়লাতে কারবন্ (Carbon—বিশুদ্ধ অঙ্গার) নামক মৌলিক পাদার্থ ই বেশীর ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন বৃক্ষদেহের অন্যান্য মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থ কোথায় গেল তাহা বুঝিতে হইবে। এই অবস্থাতে কারবন্ ছাড়া গাছের অন্য যা কিছু পদার্থ ভস্ম হইয়া যায়। কারবন্ সহজে ভস্ম হয় না, সুতরাং ইহাই অবশিষ্ট থাকিয়া কয়লা উৎপাদন করে।

অতীতের যে সব গাছ
ধরার গর্ভে আছে সুপ্ত,
বংশহীন নয় সকলে—
নয়কো তা'রা সবাই লুপ্ত।

নানা স্থান হইতে নানা আকারে প্রাপ্ত প্রাচীন লুপ্ত উদ্ভিদের দেহাবশেষের সংখ্যা বহু। এখানে মাত্র কয়েকটির কথা আলোচনা করিয়া এ বিষয়ে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইল। অতীতের সব গাছপালাই

যে একেবারে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে তাহা নহে। বর্ত্তমানের গাছপালা সেই অতীতের গাছপালারই বংশধর; কিন্তু সুদীর্ঘ সময়ের পরিবর্ত্তনে
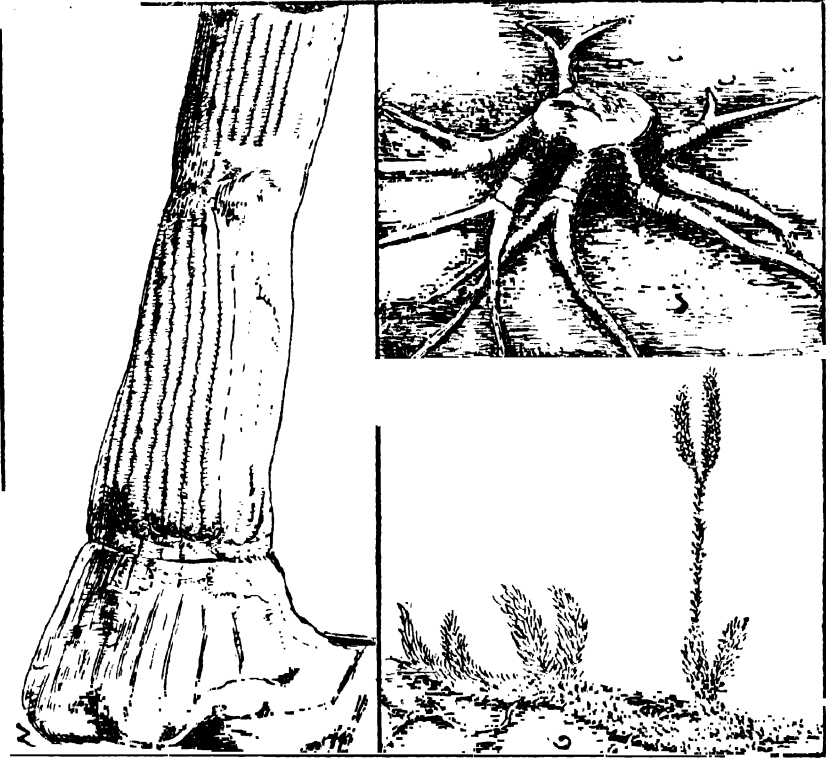
অতীতের ক্লাব-মস্ বৃক্ষের বর্ত্তমান অবনতির তুলনামূলক চিত্র

১। ইয়র্কশায়ারে কয়লার খনির ভিতরে প্রাপ্ত ক্লাব-মসের মূল। উহার কাণ্ডের ব্যাস তিনহাত পরিমাণ বিস্তৃত এবং উহার মূলগুলি প্রায় বিশহাত পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া বর্ত্তমান ছিল।

২। সেক্সনিতে (Saxony) কয়লার খনির মধ্যে, ক্লাব-মস্ বৃক্ষের কাণ্ডের এই অংশ পাওয়া যায়। উহা লম্বায় চারিহাত এবং উহার ব্যাস দুইহাত পরিমাণ।

৩। সেই ক্লাব-মসেরই বর্ত্তমান বংশধর। উহা মাটির উপর শয়ানভাবে জন্মে এবং মাত্র কয়েক ইঞ্চি উঁচু বায়বীয় কাণ্ড উৎপাদন করে।

তাহাদের অনেকেরই আকারগত অসম্ভব রকম পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। অতীতের গাছপালার মধ্যে যাহাদের বংশ একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে,

তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। উহারা অধিকাংশই আবার প্রাচীনতম উদ্ভিদ্। ক্লাব-মস্ জাতীয় উদ্ভিদ্ বর্ত্তমানে যাহা মাটির উপর শায়িতভাবে বর্দ্ধিত হয় এবং যাহার মাত্র কয়েক ইঞ্চি উঁচু শাখা, মাটির উপর দাঁড়ান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই পৃথিবীর সেই অঙ্গারক যুগে (Carboniferous Period) মস্ত বড় বৃক্ষের আকারে বর্ত্তমান ছিল। মধ্যজৈবিক যুগে (Mesozoic) নানা শ্রেণীর যে সাইকাস্ (Cycas) জাতীয় গাছ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, তাহার মধ্যে আজকাল সারা পৃথিবীতে মাত্র কয়েকটি এই জাতীয় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর প্রাচীনতম স্তরের উপরকার চিহ্ন দেখিয়া অনেকে তখনকার সময়ে যে শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ্ ছিল তাহার অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক স্থলেই অনুসন্ধান করিয়া পরে দেখা গিয়াছে যে, তাহা অন্যান্য পদার্থের চিহ্ন, বাস্তবিক তাহা শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের চিহ্ন নহে। তবে তাহাদের মধ্যে শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের চিহ্ন যে একেবারে থাকিতে পারে না, কিংবা নাই তাহাও অভ্রান্তরূপে বলা অসম্ভব।

কারা জাতীয় শৈবাল যাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের শিলীভূত বহু ছাঁচ (Fossil cast) পৃথিবীর মধ্যজৈবিক (Mesozoic) যুগের মাঝামাঝি স্তরে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ্ হইলেও উহাদিগকে এ অবস্থায় এখনও যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কারণ তাহাদের দেহেই বর্ত্তমান আছে বলিয়া মনে হয়। যে কারাগাছ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কোমল কাণ্ড, পাতা, এমন কি ফল পর্য্যন্ত জীবিত অবস্থাতেই স্বভাবতঃ চূণা পদার্থের আবরণে আবৃত হইয়া থাকে। তাহাতেই উহাদের শিলীভূত ছাঁচ গঠিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। সেজন্য শিলীভূত কারাগাছ পৃথিবীর স্তরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষভাবে তৃতীয়ক (Tertiary) ও মধ্যজৈবিক (Mesozoic) স্তরেই ইহাদের সংখ্যা

অধিক। বর্ত্তমানে এরূপ বহু শৈবালেরই পূর্ব্বপুরুষের চিহ্ন, এই সকল স্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। বালিকণা (Siliceous) সদৃশ পদার্থে নির্ম্মিত কঠিন আবরণে আবৃত, বর্ত্তমানে ডায়েটম (Diatom) নামক যে শৈবাল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের বহু শিলীভূত দেহ পৃথিবীর প্রাচীন স্তরেও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঙের ছাতা বা ছত্রক (Fungus) জাতীয় গাছের দেহ শিলীভূত অবস্থায় বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। পাথর কয়লা যুগের শিলীভূত গাছের (Coal Measure Fossils) দেহে, পরগাছারূপে মাত্র এ জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন জৈবস্তরে (Paleozoic) এই ছত্রক জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্, বন্ধুভাবে উচ্চশ্রেণীর বৃক্ষের শিকড়, পাতা ইত্যাদির ভিতর যে পরস্পরের সাহায্যে বাস করিত তাহার পরিচয় এখনও পাওয়া যায়।
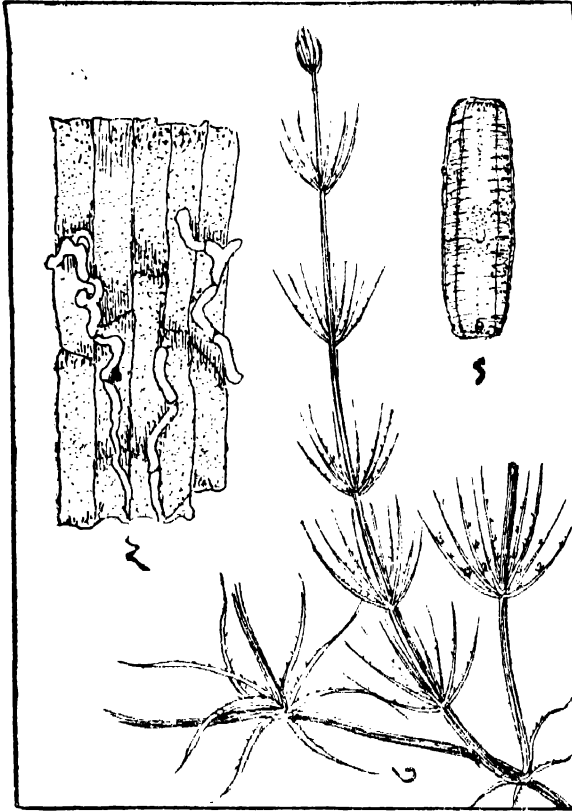
কতিপয় শেওলাজাতীয় উদ্ভিদ্

(উহাদের চিহ্ন পৃথিবীর প্রাচীনস্তরে দেখিতে পাওয়া যায়)

১। ডায়েটম (Diatom)

২। গাছের ভিতরকার কাঠের মধ্যে সুতার মত আকার বিশিষ্ট ছত্রক বা ছাতা

৩। কারা (Chara)

মস্ (Moss) জাতীয় উদ্ভিদ্, পূর্ব্বোক্ত শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ্ অপেক্ষা

উচ্চস্তরের উদ্ভিদ্ হইলেও, পৃথিবীর প্রাচীনতম স্তরে, তাহাদের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ ইহা নয় যে মস্ জাতীয় উদ্ভিদ্ সাধারণ শৈবাল হইতে কোমল। তবে তাহার কারণ কি হইতে পারে তাহা অবশ্য ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। প্রাচীনজৈবিক (Paleozoic) স্তরের সমসাময়িক কোন কোন নিতান্ত কোমল শৈবালের দেহও যখন শিলীভূত অবস্থায় পাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে, তখন মস্ জাতীয় গাছ সে সময়ে বর্ত্তমান থাকিলে, তাহাদেরও দেহ শিলীভূত অবস্থায় পাওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল। হয়ত তখন মস্ জাতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তিই হয় নাই। সে সময়ের এমন কোন সুরক্ষিত শিলীভূত গাছ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, যাহার আভ্যন্তরিক ক্ষুদ্রতম অংশ অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। নানা স্তরে তাহাদের কাণ্ড ও পাতার চিহ্ন আছে বলিয়া মনে হইলেও তাহারা যে বাস্তবিকই মস্ গাছেরই কাণ্ড কিংবা পাতা তাহা বলা কঠিন। কেননা উহার বীজ-উৎপাদক অঙ্গ, যাহা হইতে উহাদিগকে অভ্রান্তরূপে চেনা সম্ভবপর হইত, তাহার চিহ্ন উহার সঙ্গে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আর যে সকল স্তরে বাস্তবিকই উহাদের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পরবর্ত্তী সময়ের। ইহাতে মনে হয় যে, অন্যান্য নিম্নস্তরের গাছ হইতে মস্ জাতীয় গাছ অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

এমন গাছ পাওয়া গেছে
ঠিক হয় না কি জাতি,
হ'তে পারে মস্ কি শৈবাল—
ঢেঁকিশাকের জ্ঞাতি।

যে সকল নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রাচীন ডিভনিক (Devonian) বোদমাটিময় (Peat-bog) জলা জায়গার স্তরে আবিষ্কৃত রাইনিয়া ও হরনিয়া (Rhynia and Hornea) নামক উদ্ভিদ্

দুইটি অন্যতম। বিশেষজ্ঞ বহু পণ্ডিত উহাদের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু উহাদের শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহারা সকলে একমত হইতে পারেন নাই। উহাদের দেহ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ভাবেই পাওয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের কেহ কেহ উহাদিগকে শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে উহারা মস্ জাতীয় উদ্ভিদ্। আর কেহ বা উহাদিগকে ঢেকিশাক জাতীয় উদ্ভিদের সঙ্গেই স্থান দান করিয়াছেন। তোমরা হয়ত প্রশ্ন করিবে যে, এরূপ মতভেদ হওয়ার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, কারণ উহারা পূর্ব্বোক্ত উদ্ভিদের কোনটির সঙ্গেই আকারে ঠিক একমত নহে। আবার কোন না কোন বিষয়ে প্রত্যেকের সঙ্গেই সাদৃশ্য আছে। তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা যদিও মাটির উপর চারি হইতে আট ইঞ্চি পর্য্যন্ত খাড়াভাবে বর্দ্ধিত হইত, তবুও তাহাদের পাতা কিংবা শিকড় ছিল না। মাটির তলাতে শয়ানভাবে যে কাণ্ড থাকিত
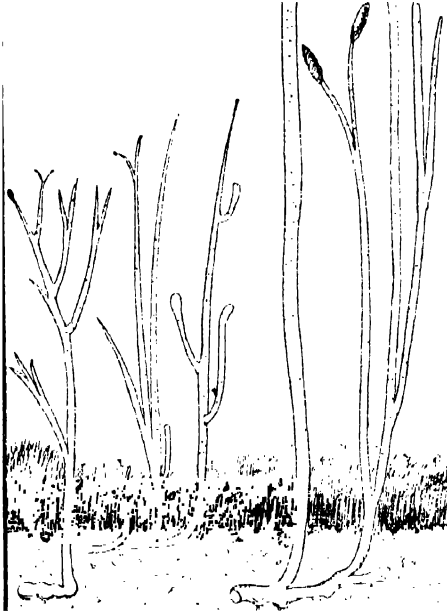
ভূমিজাত প্রাচীনতম পত্রহীন রাইনিয়া (Rhynia) ও হরনিয়া (Hornea) নামক উদ্ভিদের আনুমানিক চিত্র

তাহার নীচের দিকের সূতার মত অঙ্গ দ্বারা তাহারা খাদ্যশোষণের কার্য্য চালাইত। এজন্য উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মত শাখাপ্রশাখা-বিশিষ্ট তাহাদের শিকড় জন্মিত না। কিন্তু মাটির উপরকার বায়বীয় কাণ্ডগুলি শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট হইত। তাহাদের রং যে সবুজ ছিল সে বিষয়ে কোন

সন্দেহ নাই, কেননা সংখ্যা কম হইলেও বর্ত্তমানের গাছের মত তাহাদের দেহেও বায়ুকূপ (Stomata) ছিল। ইহা হইতেই তাহারা মাটির উপরে বাস করিবার মত উপযুক্ত আকার যে প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। অধিকন্তু তাহাদের চারা জন্মিবার জন্য যে এক প্রকার বীজের উৎপত্তি হইত, তাহার আবরণ এরূপ স্থূল ছিল যে, উহার ভিতরকার কচি চারা রৌদ্রে শুকাইয়া মরিয়া যাওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না। ভূপৃষ্ঠ-জাত উদ্ভিদের ইহাও আর একটি লক্ষণ। তাহাদের পূর্ব্বোক্ত শাখার অগ্রভাগ ফুলিয়া তাহাতে এই প্রকার বীজের উৎপত্তি হইত। ডিভনিক স্তরের হরনিয়া (Hornea) গাছ হইতেই ক্রমোন্নতির ফলে, ঢেকিশাক জাতীয় গাছের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন। হরনিয়ার বীজ তাহার শাখার অগ্রভাগে উৎপন্ন হইত। এখনও ঢেকিশাকের বীজ পাতার নীচে নিতান্ত কোমল আবরণের ভিতর উৎপন্ন হইয়া থাকে।
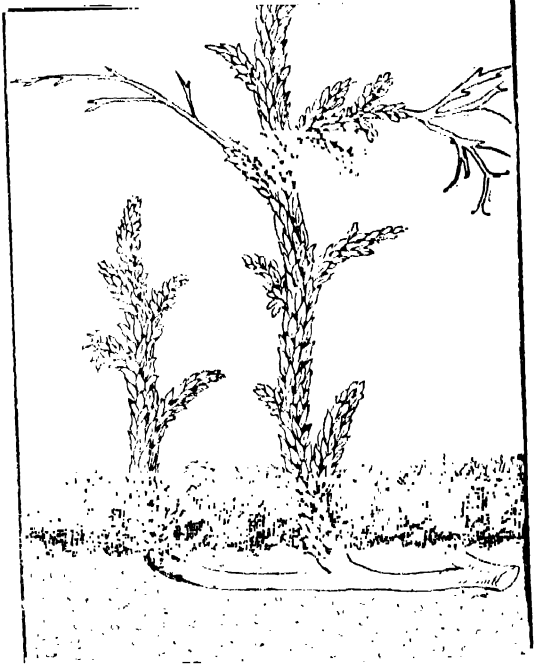
ভূমিজাত পত্রযুক্ত তারাগাছ (Asteroxylon) নামক প্রাচীনতম একটি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের আনুমানিক চিত্র

সেই ডিভনিয়ান স্তরের ভিতরেই তারাগাছ (Asteroxylon) নামক, উহাদেরই সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট অন্য আর একটি উদ্ভিদ্ পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় সুদূর অতীতের সেই প্রাচীন যুগে, উহা হইতেই প্রথম পাতার আবির্ভাব

হইয়াছিল। অবশ্য উহাদের পাতা বর্ত্তমানের গাছের পাতার মত মোটেই শিরা-উপশিরা-সমন্বিত নহে; বরং আকারে কতকটা বর্ত্তমানের ক্লাব-মসের (Club-moss) মত ক্ষুদ্র ছিল। তাহা ছাড়া উহাদের অসংখ্য পাতা, সমুদয় কাণ্ড এবং ডালপালাকে, ক্লাব-মসেরই মত আবৃত করিয়া রাখিত।

ভূপৃষ্ঠবাসী এই সকল গাছের সঙ্গে বহু শেওলা জাতীয় উদ্ভিদের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নিমাটোফাইকাস (Nematophycus) নামক সুবৃহৎ শৈবাল জাতীয় গাছ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন সিলুরিয়ান (Silurian) স্তরেও উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা মোটায় এক একটি দুই ফুট হইতে চারি ফুট পর্য্যন্ত ব্যাস-বিশিষ্ট হইত। এরূপ সুবৃহৎ শৈবাল জাতীয় গাছ এখন সমুদ্র ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। সেই প্রকাণ্ড ও অদ্ভুত ভূপৃষ্ঠবাসী নিম্নশ্রেণীর গাছ এখন আর জীবিত নাই।

বংশহীনের ধ্বংসাবশেষ
করল খুঁজে বা'র,
নইলে তা'রা রইত গোপন
জানত কেবা আর?

ঢেঁকিশাক জাতীয় গাছ, মস্ (Moss) হইতে উচ্চস্তরের। তাহাদের মধ্যে যে যে গাছ একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে স্ফিনোফাইলামের (Sphenophyllum) নাম উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে তাহাদের কোন বংশধরই আর জীবিত নাই। উহাদের শিলীভূত দেহ আবিষ্কৃত না হইলে তাহাদের অস্তিত্বের কথাও কেহ কল্পনা করিতে পারিত না। তাহারা সেই প্রাচীন জৈবস্তর (Paleozoic Period) গঠন সময়েই ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। অঙ্গারক বা পাথর কয়লার যুগের (Carboniferous Period) পাথরের স্তরের

উপর, উহাদের পত্রসংযুক্ত শাখার বহু ছাপ বর্ত্তমান আছে। উহারা নানা রকমের হইলেও, প্রত্যেকেরই কাণ্ডের সমদূরবর্ত্তী গ্রন্থিতে, পত্রগুচ্ছের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের পাতার আকার কতকটা বড় পানার মত অর্থাৎ উপরদিকে বিস্তৃত ও নীচেরদিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে আবার কোন কোনটির পাতা নিতান্ত সরু সরু। কোনটিতে বা সরু এবং বিস্তৃত এই উভয় রকমের পাতাই দেখিতে পাওয়া যায়। আর দেখিলেই মনে হয় যে, হয়ত বা তাহারা কোন জলীয় উদ্ভিদ্ই হইবে। কেননা পানিফলের ন্যায় কোন কোন জলীয় উদ্ভিদে এইরূপ দুই রকম পাতাই দেখিতে পাওয়া যায়। বিস্তৃত পাতাগুলি জলের উপরে এবং সরু পাতাগুলি জলের নীচে কাণ্ডের উপর জন্মিয়া থাকে। কিন্তু স্ফিনোফাইলামের সরু পাতাগুলির স্থান কাণ্ডের অগ্রভাগে, বীজ-উৎপাদক পাতার নীচেই। সুতরাং তাহারা যে জলের নীচে জন্মিয়াছিল তাহা কখনই মনে করা যাইতে পারে না। উহাদের কাণ্ডের ভিতরকার আকার পরীক্ষা করিলে উহারা যে শায়িতভাবে বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। সেই স্তরে তাহাদেরই অন্য দুইটি জ্ঞাতিভাই লাইকোপড্ (Lycopod) ও অশ্বপুচ্ছ (Equisetaceae) জাতীয় গাছ সেই স্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিশাল বৃক্ষ বিশেষ ছিল। তাহাদের জাতীয় অন্য কোন গাছই আর এত বড় হইতে দেখা যায় না। স্ফিনোফাইলামের সর্ব্বাপেক্ষা বড় যে গাছ পাওয়া গিয়াছে, তাহার বেড় এক ইঞ্চিরও কম।

পৃথিবীর প্রাচীনতম স্তরে ঢেঁকিশাকের চিহ্ন না পাওয়া গেলেও মধ্য-জৈবিক স্তরে তাহাদের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আকারে কতকটা ঢেঁকিশাকেরই মত, কিন্তু তাহাদের চাইতে উচ্চশ্রেণীর আর এক প্রকার উদ্ভিদ্ সেই পাথর কয়লার যুগে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। তাহাদিগকে বীজ-উৎপাদক ঢেঁকিশাক (Pteridosperms) বলা যাইতে পারে। এ জাতীয় উদ্ভিদ্ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পাথর কয়লার যুগে এজাতীয়

উদ্ভিদের সংখ্যা এতই অধিক ছিল যে, শুধু উহাদের জন্যই এ যুগের আর এক নাম ঢেকিশাকের যুগ (Age of Ferns)। এই যুগের পাথরের স্তরের উপর লাইজিনোডেনড্রন (Lygenodendron) নামক গাছের কাণ্ড, পাতা, মূল এমন কি তাহাদের দেহের অন্যান্য নিতান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ, যেমন পাতার বোঁটা ইত্যাদিও বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উহাদের বীজের আকার বেশী বড় ছিল না। উহাদের খুব বড় বীজও এক ইঞ্চির চারিভাগের
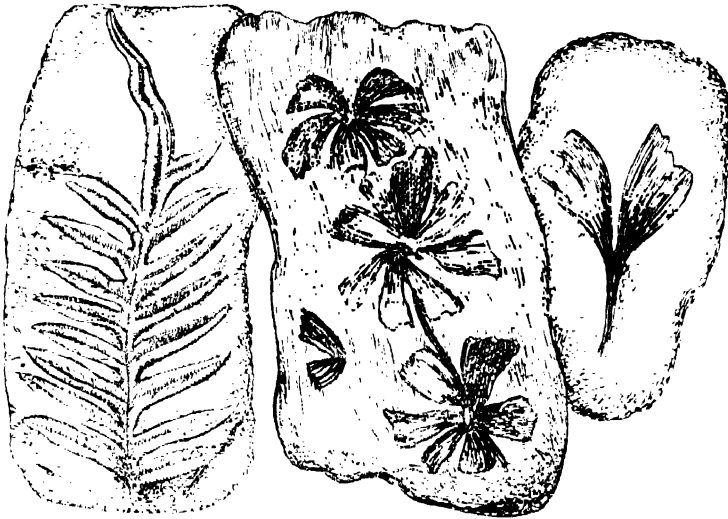
পাথরের উপর কতিপয় পাতার চিহ্ন

মেডুলসা (Medullosa) স্ফিনোফাইলাম (Sphenophyllum) জিঙ্কো (Ginkgo)

একভাগের বেশী লম্বা হইত না। উহাদের এই বীজের নাম লেজিনোষ্টোমা (Lagenostoma)। বীজের এই পৃথক নাম থাকার একটা কারণও আছে। এই বীজ যখন স্তরের ভিতর প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখন উহা কোন্ গাছের বীজ, ঠিক ধরা যায় নাই। সেই সময় উহার এই নাম রাখা হইয়াছিল। তারপর যখন লাইজিনোডেনড্রন গাছের বীজ বলিয়া উহাকে বুঝা গেল, তখনও উহার সেই নাম আর পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এই জাতীয় মেডুলসা

(Medullosa) নামক আর একটি গাছের কথাও জানা গিয়াছে। উহার সুরক্ষিত পাতা দেখিলে ঢেকিশাকের পাতা বলিয়াই মনে হয়। লাইজিনোটেরিস (Lygenopteris) ও টেলেন্‌জিয়াম (Telangium) নামক আর দুইটি গাছও অঙ্গারক যুগের স্তরে পাওয়া গিয়াছে।

অতীতের বীজ-উৎপাদক ঢেকিশাক লাইজিনোটেরিসের (Lygenopteris) ছবি

পাইন জাতীয় গাছ ঢেকিশাকের চাইতে উচ্চশ্রেণীর গাছ। পাইন জাতীয় যে সকল গাছের বিভিন্ন অংশ প্রস্তরীভূত অবস্থায় পৃথিবীর প্রাচীনতম স্তরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে সাইকাস (Cycas), জিঙ্কো

(Ginkgo) ও বেনিটাইটিসের (Bennettites) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে সাইকাস (Cycas) গাছ এখনও সচরাচর দেখিতে পাওয়া
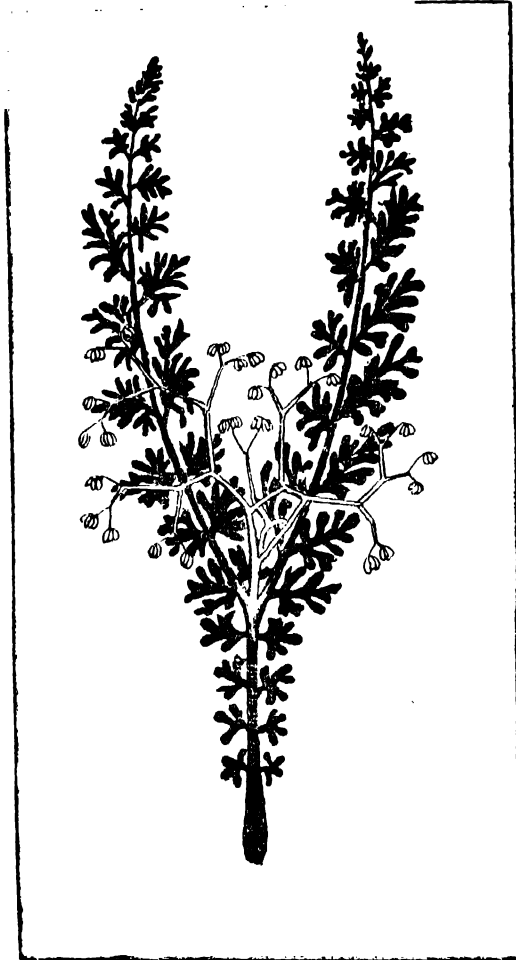
অতীতের বীজ-উৎপাদক ঢেকিশাক টেলেন্‌জিয়ামের (Telangium) ছবি

যায়। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য সৌখীন লোকে নিজেদের বাগানে উহার চারা রোপণ করিয়া থাকেন। বীজ-উৎপাদক জীবন্ত গাছের মধ্যে উহারাই

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহাদের অসমান মোটাসোটা কাণ্ড এবং পাতার সন্নিবেশ-প্রণালী কতকটা খেজুরগাছেরই মত। বর্ত্তমানে উহারা মাত্র কয়েক ফুট উঁচু হইলেও পৃথিবীর সেই প্রাচীন যুগে, উহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ ত্রিশ ফুট কি ততোধিক উঁচু হইত।

বেনিটাইটিসের কোন বংশধরই এখন আর জীবিত নাই। পৃথিবীর
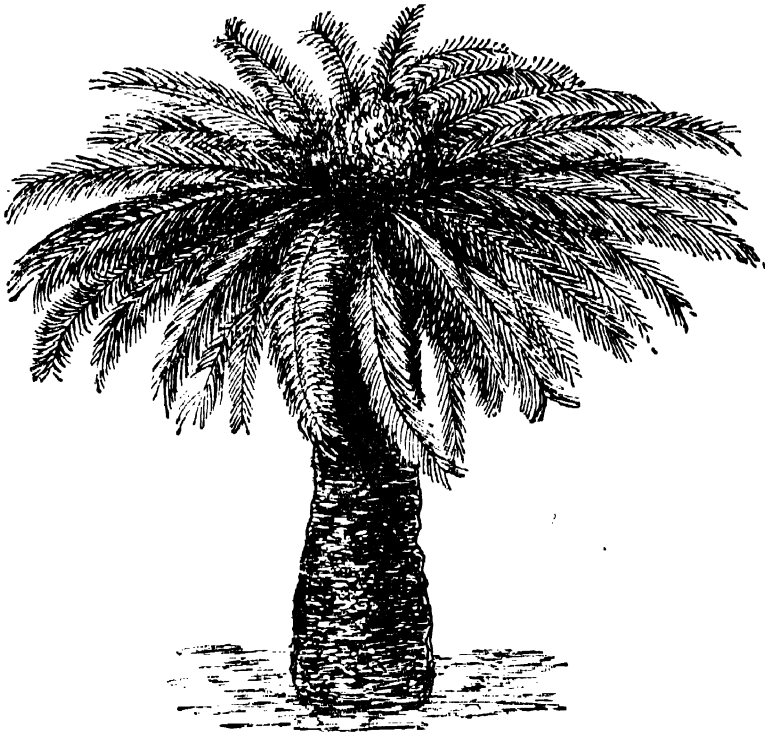
সাইকাস গাছ

প্রাচীন স্তর হইতে উহাদের শিলীভূত দেহ আবিষ্কৃত না হইলে উহাদের কথা জানিবার আর কোন উপায় ছিল না। উহাদের খবর যাহা জানা গিয়াছে তাহাও খুব বেশী দিনের কথা নয়। মধ্যজৈবিক স্তরেই উহাদিগকে প্রভূত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে তাহারা অনেকটা সাইকাসের মত

ছিল, কিন্তু তাহাদের বীজ-উৎপাদক ফুল ছিল তাহা হইতে ভিন্ন রকমের। যে সকল গাছে এখন ফুল দেখিতে পাওয়া যায় অতীতের বেনিটাইটিসেই তাহাদের সূচনা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।
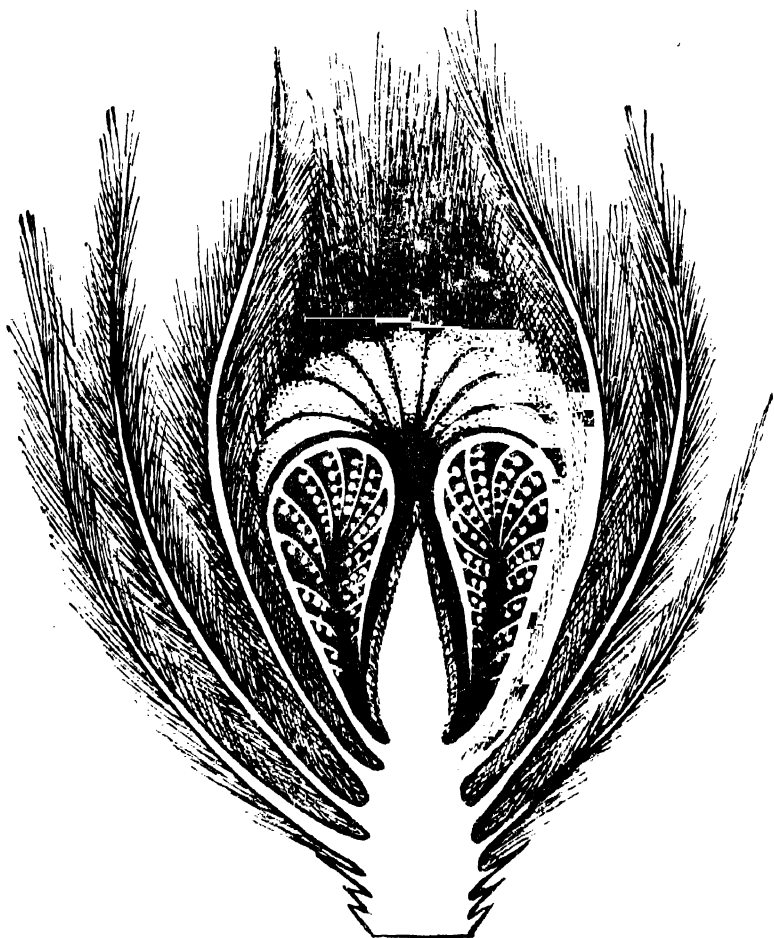
বেনিটাইটিস গাছের দ্বিখণ্ডিত বীজ-উৎপাদক ফুল (Storbilus)

উইলিয়ামসনিয়া (Williamsania) নামক বেনিটাইটিসের জ্ঞাতিভাই আর একটি গাছের খণ্ড খণ্ড অংশ ছড়ান ভাবে অন্যান্য শিলীভূত উদ্ভিদের সঙ্গে

পৃথিবীর প্রাচীন স্তরে পাওয়া গিয়াছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মত সুযোগ এখনও পাওয়া যায় নাই। উহার যে যে অংশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বেনিটাইটিসের সঙ্গে উহার প্রধানতঃ এক বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। উহার বীজ-উৎপাদক অঙ্গের লম্বা বোঁটা বেনিটাইটিস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। উহার জীবিত কোন বংশধরই পৃথিবীতে এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না।
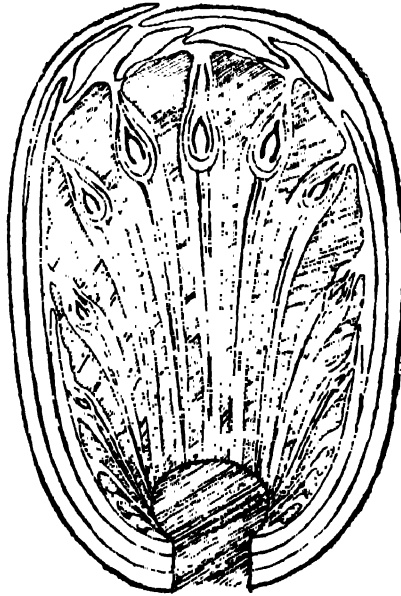
বেনিটাইটিসের বীজ-উৎপাদক অঙ্গের দ্বিখণ্ডিত ছবি

(চিত্রে লম্বা বোঁটাযুক্ত বীজ দেখান হইয়াছে)

জিঙ্কো নামক গাছও ধ্বংসমুখে। চীন জাপানের অধিবাসীরা উহাকে পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া মনে করে এবং মন্দির-অঙ্গনে উহাদের বহু চারা রোপণ করিয়া থাকে। ইহার অন্য নাম বিদ্যাপাতা বৃক্ষ (Maiden hair tree)। পাতা দেখিতে অনেকটা বিদ্যাপাতার মত বলিয়া উহার এই নাম। এই গাছ খুবই প্রাচীন। মধ্যজৈবিক স্তরে উহাদিগকে খুবই দেখিতে পাওয়া যায়, এমন

কি প্রাচীনজৈবিক স্তরেও উহাদিগকে দেখা গিয়াছে। বাগানে ছাড়া উহারা যে এখনও বনজঙ্গলে বন্য অবস্থায় জীবিত আছে, তাহা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কেহই বিশ্বাস করিত না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশের পশ্চিম প্রান্তের পর্ব্বতে,
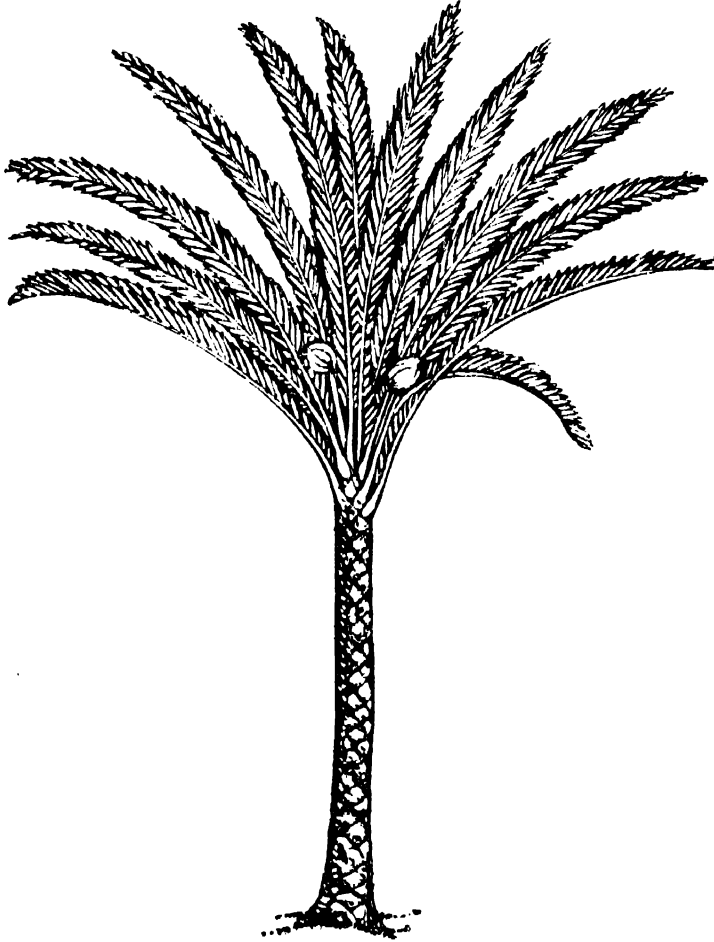
উইলিয়ামসনিয়া গাছ (Williamsania) ও উহার পত্র মধ্যে
দুইটি বীজ-উৎপাদক অঙ্গ

বন্য অবস্থায়ও যে উহারা বর্ত্তমান আছে তাহা জানা গিয়াছে। জাপানের কিউ বাগানে (Kew Garden) এই বৃক্ষ খুব সুন্দররূপে সাজান আছে।

পূর্ব্বোক্ত গাছগুলির তুলনায় ফুল-উৎপাদক গাছের উৎপত্তি অনেকটা আধুনিক। তবুও পৃথিবীতে তাহাদের আবির্ভাব যে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সম্ভবপর হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন চূণা পাথরের স্তরে একদল ও দ্বিদল বীজ উৎপাদক গাছের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।
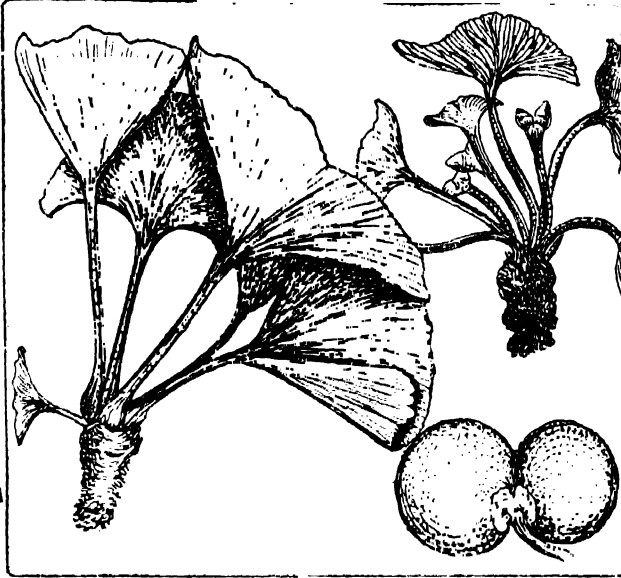
জিঙ্কো (Ginkgo) গাছের পল্লব ও বীজ

মধ্যজৈবিক স্তরেও তাহাদের চিহ্ন আছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, কিন্তু তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। ওক, ওয়ালনাট, উইলো, পপ্‌লার, ইউকেলিপ্‌টাস ও বট জাতীয় গাছ, পৃথিবীর প্রাচীন স্তরে শিলীভূত গাছের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

—শেষ—